আন্না আখমাতভা, প্রতিকৃতি : নাথান আল্টমেন

বিনায়ক সেন

আন্না আখমাতভা ও তাঁর সহচরেরা

ভিন্ন পথের যাত্রী

সেন্ট পিটার্সবুর্গ : ১৯১৩

ক্যাফের নাম 'দলছুট কুকুর'। স্ট্রে ডগ ক্যাবারে নামে ইংরেজিতে বিখ্যাত। মিখাইলভস্কায়া স্কয়ার আর ইতালিয়ানস্কায়া স্ট্রিটের কোনায় এর অস্তিত্ব প্রায় চোখেই পড়ে না। এর কারণ ক্যাফেটা রাস্তার লেভেল থেকে অনেকটাই নিচুতে। যেতে হলে ঘোরানো একটা সিঁড়ি দিয়ে বেশ কিছুটা নামতে হয়। ঢোকার মুখের দরজাটাও খাটো। মাথা নুইয়ে শীতের টুপি না খুলে কেউ তার ভেতরে ঢুকতে পারে না। ক্যাফের সব জানালা কাঠের তক্তা দিয়ে বন্ধ করা, এর ফলে বাইরের জগতের কোনো আওয়াজ ভেতরে ঢোকার উপায় নেই। সিলিংসহ চারদিকের দেয়ালে অসাধারণ উজ্জ্বল রঙে নানা ধরনের ফুল, পাখি, মাছ, জীবজন্তু আঁকা। বোঝাই যাচ্ছে, অতি উঁচু মানের কোনো শিল্পী এভাবে ছবি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেনিন, প্রতিকৃতি : ইউরি আন্নেকভ

লেয়ন ত্রৎস্কি, প্রতিকৃতি : ইউরি আন্নেকভ

এঁকেছেন। বোদলেয়ারের *ক্লেদজ কুসুম* কাব্যগ্রন্থে অনুপ্রাণিত হয়ে চিত্রশিল্পী সের্গেই সুদেইকিন এসব কল্পনাপ্রসূত পাখি ও ফুল চিন্তা করে থাকবেন। সস্তা সিগারেটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে ভেতরটা। একপাশে ড্রাম, স্যাক্সোফোন, চেলো, ভায়োলিন ও পিয়ানো; অন্য পাশে ক্যাবারের ব্যবস্থা। সেখানে প্রায় রাতেই গান করেন ওলগা গ্লেবোভা। ওলগা এরই মধ্যে মেয়ারহোল্ডের প্রথাবিরোধী নাটকে অভিনয় করে নাম কুড়িয়েছেন। প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই ক্যাফেটায় গিজগিজ করে মানুষ। অবশ্য প্রচলিত অর্থে একে ঠিক ক্যাফেও বলা চলে না। এখানে যারা জড়ো হয় তাদের মধ্যে দুধরনের লোক দেখা যায়। একদল আসে আড্ডা দিতে, আরেক দল তাদের আড্ডা দেখতে।

১৯১৩ সালে 'দলছুট কুকুর' ছিল সেন্ট পিটার্সবুর্গের সবচেয়ে আভাঁগার্দ ক্যাফে। ১৯১২ সালের নববর্ষের ঠিক আগে আগে ক্যাফেটা খোলা হয়। খোলার পর থেকেই শহরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ক্যাফে হয়ে উঠেছে এটি। এখানে সব ধরনের আয় ও খ্যাতির—ইতিমধ্যেই নাম করে ফেলা বা যশঃপ্রার্থী—কবি, সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী ও সংগীতশিল্পীরা নিয়মিত জড়ো হতেন। শিল্পী-সাহিত্যিকদের ঢুকতে কোনো পয়সা লাগত না, কিন্তু আর যারা ঢুকত তাদের মাথাপিছু ২৫ রুবল করে মোটা অঙ্কের এন্ট্রি-ফি দিতে হতো। তার পরও ভিড় লেগেই থাকত এখানে। এর কারণ বোঝা শক্ত নয়। আর কোথায় এমন করে দর্শকেরা দেখতে পাবে ব্যালেরিনা তামারা কারসাভিনার রিহার্সাল, চেয়ারের ওপরে দাঁড়িয়ে ভ্লাদিমির মায়াকোভ্স্কির 'ট্রাউজারের মধ্যে মেঘ' কবিতার জোরে জোরে আবৃত্তি, স্বচক্ষে দেখতে পাবে স্বয়ং আন্দ্রেই বিয়েলিকে—যার *পিটার্সবুর্গ* উপন্যাস সবে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। আর কোথায় তারা দেখতে পাবে চিত্রশিল্পী কাজিমির মালেভিচকে বা তরুণ কবি ওসিপ মান্দেলস্তামকে। ঘরানায় বা স্বভাবে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, ছোট ছোট টেবিলের চার কিনারে ঘন হয়ে বসে এখানে একসঙ্গে গল্প করছেন বিভিন্ন শিল্প-আন্দোলনের মানুষেরা। এঁদের মধ্যে কেউ সিম্বলিস্ট, কেউ কেউ ফিউচারিস্ট বা আকমেইস্ত ধারার কবি বা চিত্রশিল্পী। এক পেয়ালা কফি নিয়ে এঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার করে দিতে পারেন। মাঝে মাঝে বিদেশি অতিথিদেরও দেখতে পাওয়া যায় এখানে। কিছুদিন আগেই ঘুরে গেছেন ইতালীয় ফিউচারিস্ট ফিলিপ্পো মারিনেত্তি ও সুরকার রিচার্ড স্ট্রাউস। সেই অর্থে, 'দলছুট কুকুর' কোনো ক্যাফে নয়, বরং অনেকটা ক্লাবের মতো—যেখানে নিয়মিতভাবে দর্শন শিল্পকলা নিয়ে যেমন সিরিয়াস বক্তৃতার আয়োজন করা হয়, তেমনি অনুষ্ঠিত হয় কোনো নবীন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পীর আধুনিকতম চিত্রপ্রদর্শনী। কখনো কখনো বসে ধ্রুপদি সিম্ফনি ও আরিয়ার আসর। আভাঁগার্দের যাঁরা তাঁরা তো আসেনই, কিন্তু মূলধারার শিল্পীরাও অনেক সময় ঘুরে যান বন্ধুবান্ধবসহ। মূলধারার মঞ্চে তখন নাচছেন আন্না পাভলোভা ও নিঝিনস্কির মতো ব্যালে-শিল্পীরা। মারিনস্কি থিয়েটারে ফিওদর শালিয়াপিনের গান শোনার টিকিট বিক্রি হয়ে যাচ্ছে দু-তিন সপ্তাহ আগে থাকতেই আর আলেকজান্দ্রিনস্কি থিয়েটারে মঞ্চস্থ হচ্ছে চেখভ ও বুলগাকভের নাটক।

তবে 'দলছুট কুকুর'-এর শিল্পসাহিত্যের জগৎ মূলধারার বাইরে। প্যারিসের পাশাপাশি ১৯০৫ থেকে ১৯১৩ সালের মধ্যে রাশিয়ায় এই পিটার্সবুর্গেই সূচিত হয়ে যাবে বিশ শতকের প্রথমার্ধের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ আভাঁগার্দ শিল্পকলার আন্দোলন। চিত্রকলায় মার্ক শাগাল ও ভাসিলি কান্দিনস্কি, সংগীতে সের্গেই প্রকোফিয়েভ ও ইগোর স্ত্রাভিনস্কি; উপন্যাসে ইভান বুনিন ও আন্দ্রেই বিয়েলি; কবিতায় আলেকসান্দর ব্লক, ফিওদর ত্যুচেভ ও ভ্লাদিমির মায়াকোভ্স্কি। এঁদের কেউ এই মুহূর্তে রাশিয়ায়, কেউ ইতালিতে আর কেউ ফ্রান্সে বা জার্মানিতে। যেখানেই কাজ করুন তাঁরা—বিশ শতকের আধুনিকতম শিল্পকলার একটি প্রধান ধারার উদ্বোধন হচ্ছে এঁদের হাত ধরেই। এঁরা জারতন্ত্রের মধ্যে বাস করে স্বপ্ন দেখছেন অন্য এক রাশিয়ার। এঁদের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু এঁরা সবাই মনে করেন, একমাত্র নতুন শিল্পসাহিত্যই জন্ম দিতে পারে নতুন এক সমাজের। আর 'দলছুট কুকুর' ক্যাফে হচ্ছে এঁদের ও এঁদের পরবর্তী শিল্পী-সাহিত্যিক প্রজন্মের সূতিকাগার। এই ক্যাফের স্মৃতি আন্না আখমাতভার কবিতাতেও উঠে এসেছে।

আন্না আখমাতভার দীর্ঘ কবিতা 'যে কবিতার নায়ক নেই' লেখা হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে। এর শুরুতে ছিল ১৯৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের রাতে নববর্ষ উদ্‌যাপনের একটি দৃশ্য। হিটলারের জার্মান নাৎসি বাহিনী তখন রাশিয়া আক্রমণ করেছে। নববর্ষকে সামনে রেখে আখমাতভা প্রদীপ জ্বালিয়েছেন, স্ফটিকের পানপাত্র সাজানো হয়েছে, জড়ো করা হয়েছে নানা স্বাদের লাল-সাদা পানীয়, একটু পরেই আসবেন আমন্ত্রিত অতিথিরা, পরিচিত কণ্ঠস্বরে ভরে উঠবে নিঃসঙ্গ আখমাতভার ছোট্ট বসার ঘর। অকস্মাৎ এক দৈব-দুর্বিপাকে তিনি দেখতে পাবেন তাঁর চারপাশে নববর্ষ উপলক্ষে ভিড় করেছে জীবিত নয়—তাঁর মৃত বন্ধু ও স্বজনদের দল, তাদের ফিসফিসানো ধ্বনিতে ডুবে গেছে কক্ষের সব আলো। হঠাৎই আন্না নিজেকে দেখতে পাবেন ১৯১৩ সালের সেন্ট পিটার্সবুর্গের সেই 'দলছুট কুকুর' ক্যাফের ভেতরে। তখন তাঁর তারুণ্যদীপ্ত সময়, বয়স সবে ২৪ পেরিয়েছে, ইতিমধ্যেই *সন্ধ্যা* নামে তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে। আর এর সূত্র ধরে তাঁর নাম রুশ সাহিত্যমোদী মহলে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে তিনি যে কবি নিকোলাই গুমিলিয়ভের স্ত্রী—সেটাও আছে তাঁর দ্রুত পরিচিতির মূলে।

গুমিলিয়ভের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে ১৯১০ সালে। এই বিয়ের সূত্রে একসময় যিনি ছিলেন মফস্বলের আন্না গোরেনকো, তিনি রাজধানীতে এসে হয়েছেন আন্না আখমাতভা। নামটা অবশ্য তাঁর নিজেরই উদ্ভাবিত। আন্না হঠাৎই আবিষ্কার করেছেন যে তাঁর মায়ের দিকের কোনো পূর্ব প্রজন্মের মধ্যে একজন ছিলেন তাতার বংশীয় রাজকন্যা, তাঁর নামও ছিল আখমাতভা। অকাব্যিক গোরেনকো উপাধিটি ছেঁটে ফেলে আন্না নতুন পদবি নিয়েছেন আখমাতভা। পরবর্তীকালে নোবেলজয়ী রুশ কবি জোসেফ ব্রদস্কি বলবেন, আখমাতভা নামটির চয়ন ছিল 'আন্নার প্রথম কবিতা'। বিবাহসূত্রে গুমিলিয়ভা লেখা উচিত ছিল, কিন্তু তিনি সেটা করেননি। গুমিলিয়ভের সঙ্গে তাঁর বৈবাহিক জীবন সুখের ছিল না। শেষ জীবনে আন্না তাঁর স্মৃতিকথায় এই বিয়েকে বলেছেন—'দুই অপরিচিতের মিলন'। গুমিলিয়ভ অল্প বয়সেই মারা যান। মাত্র ১২ বছরের বিবাহিত জীবন ছিল তাঁদের। তাঁদের একত্র জীবনকে অসুখী মনে করার কারণ হিসেবে গুমিলিয়ভের ব্যাখ্যা আরও নির্দয়। তিনি মনে করেন, তাঁর বিয়ে হয়েছে 'স্ত্রীর সঙ্গে নয়, যেন এক ডাইনির সঙ্গে'। তবে তার পরও আন্নাকেই তিনি উৎসর্গ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছেন তাঁর গদ্যরচনা *থ্রি নভেলা*। কবিতাও লিখেছেন একাধিক।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে আখমাতভার মনে পড়বে 'দলছুট কুকুর' ক্যাফের আরও অনেক দৃশ্য। যেমন: ক্যাফের চেয়ারে হলুদ গেঞ্জি পরে বসে আছেন মায়াকোভ্স্কি, তাঁর সঙ্গে মিখাইল কুজমিন ও মান্দেলস্তাম। এঁদের থেকে কিছুটা দূরত্বে একা বসে আছেন তিনি। তাঁর হাতে জ্বলছে সিগারেট। এই নিয়ে পরপর তিনটা সিগারেট খেলেন। তাঁর পরনে আঁটোসাঁটো স্কার্ট, কাঁধে স্কার্ফ, গলায় লাল রুবির একটি নেকলেস। তাঁর চারপাশে সব সময় ঘিরে থাকে নানা বয়সের গুণগ্রাহীরা। শুধু কবিতার টানে নয়, চোখ ঝলসে দেওয়া তাঁর সৌন্দর্য এর একটা বড় কারণ। প্রবীণ কবি আলেকসান্দর ব্লক পর্যন্ত বলেছেন, আখমাতভার সৌন্দর্য 'অদ্ভুত ভীতিকর'। মান্দেলস্তাম পরবর্তী সময়ে বলেছেন, আন্না হচ্ছেন একটি 'কালো পরি'। আসলে আখমাতভার জনপ্রিয়তার মূলে যত-না ছিল তাঁর সৌন্দর্য, তার চেয়ে বেশি ছিল তাঁর কবিতা পড়ার আকর্ষণীয় ধরন। আন্নার 'সমসাময়িক কালে তাঁর চেয়ে সুরেলাভাবে কোনো কবিকে আমি কবিতা পড়তে দেখিনি,' মন্তব্য করেছেন চিত্রশিল্পী ইউরি আন্নেকভ। পরবর্তীকালে প্যারিসে চলে যাওয়া রুশ সমালোচক গিওর্গি এডামভিচ বলেছেন, 'অনেককেই আজ স্মৃতিচারণা করতে শুনি—আন্না নাকি সুন্দরী ছিলেন। তিনি সে রকম কিছু ছিলেন না; ছিলেন সুন্দরের চেয়েও বেশি কিছু, সুন্দরের চেয়েও শ্রেয়তর কিছু। আমি এমন কোনো নারীকে কোথাও দেখিনি, যিনি প্রকাশ-ক্ষমতায়, অন্য ভুবনের মধ্যে সহজাত আত্মনিমগ্নতায় আর অব্যাখ্যাত এক আবেদনময়তায় এতটা বিশিষ্ট। এসব গুণে তিনি ছিলেন পৃথিবীর সব সুন্দরী নারী থেকে আলাদা।' একটু অতিশয়োক্তি শোনালেও এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে আমেদেও মদিলিয়ানি থেকে শুরু করে কিউবিক চিত্রকলার নাথান আল্টমেন, আলেকসান্ডার টাইসলার প্রমুখ চিত্রশিল্পী তাঁর প্রতিকৃতি আঁকবেন অথবা রচনা করবেন একাধিক ভাস্কর্য।

মদিলিয়ানি যখন বিখ্যাত হননি, সেই

নতুন যুগে স্ট্রে ডগ ক্যাবারের নামফলক

১৯১০ সালে প্যারিসের লাটিন কোয়ার্টারে আন্নার পরিচয় হবে এই ইতালীয় ইহুদি বংশোদ্ভূত চিত্রশিল্পীর সঙ্গে। তাঁর আঁকা একটি চিত্র আন্না আজীবন রেখেছেন নিজের কাছে। অবশ্য আখমাতভার আত্মস্মৃতিতে এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে মদিলিয়ানি তাঁর প্রেমে পড়েছিলেন। পরবর্তীকালে মদিলিয়ানির আঁকা আন্নার একাধিক স্কেচ পাওয়া গেছে, যার একটি আন্নার ন্যুড প্রতিকৃতি। এর থেকে ধারণা হয় যে আমেদেও মদিলিয়ানির সঙ্গে আখমাতভার সম্পর্ক কোনো নিছক প্লেটোনিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিল না। গুমিলিয়ভের সঙ্গে অসুখী বিয়ের কারণে আন্না প্রায় সারা জীবন ধরেই খুঁজবেন নানা বয়সের প্রেমিক—এটাও এখন মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত। তাঁর প্রেমিকদের তালিকায় পরবর্তীকালের রুশ বংশোদ্ভূত খ্যাতনামা অক্সফোর্ড দার্শনিক ইসাইয়াহ বার্লিনের নামও উচ্চারিত হবে। এ কথা উচ্চারণ করবেন জোসেফ স্তালিন নিজে—১৯৪৫ সালে—আখমাতভার ফ্ল্যাটে ইসাইয়াহ বার্লিনের রাত্রিযাপনের পরে। স্তালিনের বশংবদ রাজনীতিক লেনিনগ্রাদের পার্টি সেক্রেটারি জদানভ এমনকি মুখ ফসকে এও বলে বসবেন, আন্না হচ্ছেন 'অর্ধেক নান, অর্ধেক কামিনী'।

'দলছুট কুকুর' ক্যাফেতে আখমাতভার সঙ্গে আরও যাঁদের দেখা যাবে তাঁর মধ্যে মান্দেলস্তাম ছাড়াও আছেন মস্কো থেকে মাঝে মাঝে আসা মারিনা সিভেতায়েভা। মারিনার বাবা বহু পরিশ্রমে মস্কোর ফাইন আর্টস মিউজিয়াম গড়ে তুলেছেন। এই পরিবার পিটার্সবুর্গেও পরিচিত। প্রতিভার বিচারে পরবর্তী বছরগুলোয় আন্নার নিকটতর তুলনা হবেন মারিনাই। ১৯১৩ সালে আন্নার সুকণ্ঠে আবৃত্তি শোনার পর প্রায় মূর্ছা যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল সিভেতায়েভার। তখনই আখমাতভাকে উদ্দেশ করে লিখেছিলেন একটি কবিতা: 'কে এই নারী এতটা মেঘাচ্ছন্ন মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে?' পরবর্তী সময়ে, ১৯২০-এর দশকে, আন্নাকে উৎসর্গ করে তিনি লিখবেন আরও একগুচ্ছ কবিতা।

ওসিপ মান্দেলস্তামও আকৃষ্ট হবেন আখমাতভার প্রতি। ওসিপের তখন ঘন ঘন প্রেমে মূর্ছা যাওয়ার সময়। কিন্তু আন্না এমন ব্যবস্থা নেবেন যাতে করে সে রকম নেশা তাঁর মন থেকে একেবারে মুছে যায়। কেননা আখমাতভা জানেন, তাঁর জীবনে স্বল্পস্থায়ী প্রেমিক নয়, দরকার একজন অকৃত্রিম বন্ধুর, যে সম্পর্ক হবে দীর্ঘকালের জন্য। আর এক ক্ষীণকায় কবির মধ্যে 'সেরা বন্ধু' হওয়ার সব লক্ষণ তিনি খুঁজে পেয়েছেন। এই ক্যাফেতেই আন্নার দেখা হয়েছে চিত্রকর লিওনিদ পাস্তেরনাক ও তাঁর তরুণ পুত্র বরিসের সঙ্গে। তিনি লিওনিদের কাছ থেকে শুনেছেন যে বরিস পাস্তেরনাক এরই মধ্যে কবিতা লিখতে শুরু করেছেন—তাঁর মধ্যে আছে ১৯০৫ সালের অসমাপ্ত অভ্যুত্থানে শহীদ হওয়া লেফটেন্যান্ট স্মিড্ট-এর ওপর এক দীর্ঘ কবিতার খসড়া। বরিসের এই তরুণ বয়সের কবিতাটি আন্নার মনোযোগ কেড়েছে। আখমাতভার নিজের কাব্যগ্রন্থ *সন্ধ্যা* নিয়ে এর মধ্যে বেশ কিছু দীর্ঘ সমালোচনা বেরিয়েছে। কর্নেই চুকোভ্স্কি সমালোচক হিসেবে সবার কাছে শ্রদ্ধাভাজন। তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে এই কাব্যের সমালোচনা লিখেছেন। চুকোভ্স্কির মতে, আগামী দুই-তিন প্রজন্ম ধরে 'রুশিরা প্রেমে পড়লে এ বই তাদের সঙ্গে রাখতেই হবে'।

লিরিকের মেজাজে আখমাতভা কবিতা লেখেন, যার মুখ্য বিষয়বস্তু সমাজ নয়, ব্যক্তি আন্না নিজে। ভালোবাসা, বিষণ্ণতা, বিচ্ছেদ, শোকের মাতম—এসব তাঁর প্রথম দিককার কবিতার উপজীব্য। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ দেবদূতেরা তাঁর কবিতার ওপর ভর করেন। ভালোবাসার ও শোকের কবিতার মধ্যে আকস্মিকভাবে ঢুকে পড়ে তীব্র রাজনৈতিক বোধসম্পন্ন কোনো লাইন, কোনো অপ্রত্যাশিত দার্শনিক উপলব্ধি, কোনো নীরব সামাজিক প্রতিরোধের ছায়া।

লেনিনের নেতৃত্বে সংগঠিত অক্টোবর বিপ্লব, ১৯১৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেমনটা লিখেছেন আন্না তাঁর সাম্প্রতিক একটি কবিতায় : 'শোকস্তব্ধ পুরো শহরটা চলেছে কোনো এক গন্তব্যের দিকে, যার হদিস মেলে না।' এটা যখন লেখা—অর্থাৎ ১৯১৩ সালে—সেন্ট পিটার্সবুর্গের রাস্তায়-পার্কে তখন চলছে উৎসবের আলোকসজ্জা। এর কারণ রাষ্ট্রীয়, রাশিয়ায় রোমানভ বংশের জারদের শাসনকাল দু শ বছর পেরিয়েছে। এ উপলক্ষে সারা শহরে জারদের বড় বড় প্রতিকৃতি টাঙানো হয়েছে। অবশ্য বর্তমান জার নিকোলাইকে দুর্বল প্রকৃতির মানুষ মনে করে সবাই। শক্ত হাতে সুশাসন নিশ্চিত করে রাষ্ট্রচালনার মানসিকতা বা শক্তি কোনোটাই তাঁর নেই। তাঁকে নির্ভর করতে হয় পিওতর স্তোলিপিনের মতো রাজভক্ত আমলাদের ওপর। এই সেদিনও এক রহস্যময় পরিস্থিতিতে আততায়ীর হাতে নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রুশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন স্তোলিপিন। ১৯১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কিয়েভে অপেরা হাউসে রিমস্কি-করসাকভের একটি পালা দেখার সময় অনেকটা লিংকনীয় কায়দায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিলেন তিনি। এর পর থেকেই সারা রাশিয়ায় যখন-তখন ধরপাকড় হচ্ছে। বামপন্থীরা ছাড়াও সংখ্যালঘু ইহুদি, পোলিশ, জিপসি ও বোহেমিয়ানরা এসব আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন নিজে ১৯০৬ থেকে ১৯১১ পর্বের বছরগুলোকে 'স্তোলিপিন প্রতিক্রিয়াশীলতার যুগ' বলে অভিহিত করেছেন।

তবে এসব রাষ্ট্রীয় তৎপরতা নিয়ে আপাত দৃষ্টিতে বিচলিত নন 'দলছুট কুকুর'-এর সান্ধ্য অতিথিরা। এসব রাজনৈতিক ঘটনাকে জীবনের কম গুরুত্বপূর্ণ দিক মনে করে ক্যাফের অন্য সবার মতো আখমাতভারও মন পড়ে আছে অন্য জায়গায়। এখানে যাঁরা আসেন, তাঁদের মধ্যে অবশ্য বিপ্লববাদীরাও আছেন কেউ কেউ। কিন্তু চালচুলোহীন বোহেমিয়ানরাই সংখ্যাধিক্যে। আন্না তার পরও ভুলতে পারেন না সাম্প্রতিক অতীতের একটা বড় ঘটনা। ১৯০৫ সালের অসমাপ্ত জন-অভ্যুত্থানের গল্প, 'রক্তাক্ত রবিবার'-এর নিরস্ত্র জনতার মিছিলে জার

জোসেফ স্তালিন

নিকোলাই বুখারিন

নিকোলাইয়ের অতি-উৎসাহী জানদার্ম (পুলিশ) বাহিনীর নির্বিচার গুলিবর্ষণের স্মৃতি সহজে ভুলে যাওয়ার নয়। আন্নার মনে হচ্ছে, এটা যেন গতকালের সংবাদপত্রের ঘটনা। অজান্তেই আখমাতভার শহর পিটার্সবুর্গ গড়িয়ে চলছে এক অপ্রতিরোধ্য গন্তব্যের দিকে। ১৯১৭ সালের শরৎকালের পুরোনো ক্যালেন্ডারের পাতার ২৫ অক্টোবরের দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন অবধি আর খুব বেশি বাকি নেই। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ এই ক্যাফের অভিনেতা-শিল্পী-সাহিত্যিক-কবি-চিত্রকর-সমালোচকদের পরস্পরের থেকে কোথায় যে ছিটকে ফেলবে, তা 'দলছুট কুকুর'-ক্যাফের সবচেয়ে বড় ফিউচারিস্ট কবিরও কল্পনার বাইরে।

কংগ্রেসের কাছে খোলা চিঠি : ১৯২৩

এই 'ছিটকে পড়ার' ক্রান্তিকাল জানতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ১৯২৩ সালে। অক্টোবরের বলশেভিক বিপ্লব হয়ে গেছে বছর ছয়েক হলো। এর মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে শেষও হয়ে গেছে। ১৯১৮-২১ ছিল বলশেভিকদের জন্য সবচেয়ে জটিল সময়। ১৯১৭ সালের অক্টোবরে বিপ্লব করার চেয়েও কঠিন কাজ ছিল পরবর্তী চারটা বছর ভেতরের ও বাইরের আক্রমণ থেকে বিপ্লবকে বাঁচিয়ে রাখা। ১৪টি দেশ এই নবীন রাষ্ট্রটিকে চারপাশ থেকে ঘিরে একযোগে আক্রমণ করেছিল। কোনোভাবে এই কঠিন সময়টা পার করেছেন লেনিন ও তাঁর বলশেভিকরা। পলিটব্যুরোর প্রতিটা সদস্য দিনে ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা পরিশ্রম করে থাকেন। এদিকটার প্রতি খেয়াল রাখার দায়িত্ব লেনিনের ওপর। পার্টির নেতাদের কারও কারও স্বাস্থ্য ইতিমধ্যেই ভেঙে পড়েছে। ১৯১৮ সালে প্রচণ্ড জ্বরে ভুগে মারা গেছেন ইয়াকভ সির্ভের্দলভ। ১৯২০ সালে মারা গেছেন ইনেসা আরমান্দ—লেনিনের খুব কাছের মানুষ ছিলেন তিনি। ফেলিক্স দেঝেরঝিনস্কিকে (ও মাক্সিম গোর্কিকেও) সাবধান করেছেন লেনিন। দেঝেরঝিনস্কির কিছু হলে রাশিয়ার নিরাপত্তাব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। আর গোর্কির মৃত্যু হলে নতুন সংস্কৃতির সবচেয়ে জ্বলজ্বলে তারাটাই নিভে যাবে।

১৯২১ সাল থেকে 'নিউ ইকোনমিক পলিসি'—সংক্ষেপে ন্যাপ—বলে অর্থনৈতিক সংস্কারের এক অভিনব নীতি চালু হয়েছে রাশিয়ায়। এতে করে বেশ কিছুটা ফল মিলেছে ইতিমধ্যেই। ১৯১৮-২০ সালে 'ওয়ার কমিউনিজম' চলছিল দেশে—কৃষকের গোলায় কোনো ধান ছিল না, কোষাগারের সব অর্থ ব্যয় হয়ে যাচ্ছিল গৃহযুদ্ধের পেছনে, দুর্ভিক্ষ দেখা দিচ্ছিল রাশিয়ার নানা জায়গায়। লেনিনকে তাই পিছু হটতেই হয়েছে। কৃষকদের উৎসাহ দেওয়া চাই, যাতে করে তারা নিজেরা খেয়ে-পরে উৎপাদন বাড়াতে উৎসাহী হয়। এতে করে যদি কিছু কাল—দুই বা তিন দশক—কৃষি খাতে ব্যক্তিগত মালিকানা রেখে দিতে হয়, তবে তা-ই করতে হবে। কৃষক ভালো থাকলে শ্রমিকও অল্প মূল্যে রুটি কিনতে পারবে, কৃষক ও শ্রমিকের মধ্যে মৈত্রী জোরদার হবে, তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়নও ভালো থাকবে। কখন এগোতে হয় আর কখন পেছাতে হয়, লেনিনের এটা ভালোই জানা। রাজনীতির কৌশলে লেনিনের মতো তীক্ষ্ণধী রাজনীতিক পুরো ইউরোপে দ্বিতীয় আর কেউ নেই এখন। কিন্তু সামগ্রিক

আলেকজান্দ্রিনস্কি থিয়েটার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিছুটা ভালোর দিকে মোড় ফেরা সত্ত্বেও লেনিনের মনে শান্তি নেই। কয়েক মাস আগের একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত তাঁকে প্রবল অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছে। তাঁর শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, এটাও তাঁর চিন্তার আরেকটি বড় কারণ।

১৯১৮ সালের ৩০ আগস্ট মস্কোয় একটি কারখানায় গিয়ে ভাষণ দেওয়ার সময় আততায়ীর গুলিতে মারাত্মকভাবে আহত হন লেনিন। চরমপন্থী মারিয়া স্পিরিদনভার নেতৃত্বাধীন সোশ্যালিস্ট রেভোল্যুশনারি পার্টি—সংক্ষেপে, এসেরভদের পার্টি—অক্টোবর বিপ্লবে অংশ নিয়েছিল। বলশেভিকরা চেয়েছিল 'সোভিয়েত' সংগঠনগুলোর মধ্যে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করে জনপ্রতিনিধিত্বকারী এক নতুন ধারার সংসদ দাঁড় করাতে—কেননা এসব সংগঠনে তাদের ছিল সংখ্যাধিক্য। এসেরভরা চেয়েছিল পুরোনো পার্লামেন্ট বা কন্সটিট্যুয়েন্ট এসেম্বলির পুনরুজ্জীবন—কেননা সেখানে তাদের জোরালো অবস্থান ছিল। বলশেভিকরা এসেরভদের সঙ্গে সহমত না হওয়ায় লেনিনকে তারা 'বিশ্বাসঘাতক' আখ্যা দিতে শুরু করে। এই এসেরভদের পার্টিরই এক তরুণ সদস্যা, ফ্যানি কাপলান, লেনিনকে গুলি করে মেরে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে। ওই একই দিনে, পেত্রোগ্রাদ (১৯১৮ সালে সেন্ট পিটার্সবুর্গের নাম) গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধান মোইসেই উরিৎস্কির ওপরও হামলা হয়। গোয়েন্দা দপ্তরের তৎকালীন নাম ছিল চেকা। একই দিনে দু-দুটো হামলা ছিল একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা। উরিৎস্কি মারা যান, কিন্তু লেনিন বিস্ময়করভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন। এ দুটো ঘটনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় 'রেড টেরর' পর্ব। অনেকটা বাধ্য করা হয়েছিল বলশেভিকদের এটা শুরু করতে। এর সঙ্গে তিরিশের দশকে পরিচালিত শুদ্ধি অভিযানের চরিত্রের মৌলিক পার্থক্য রয়ে গেছে। আমরা তা একটু পরেই দেখব।

সেবার লেনিন বেঁচে গিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য আর আগের মতো চলছিল না। ১৯২২ সালে প্রথমবারের মতো স্ট্রোক হলো তাঁর। এর ফলে তাঁর দেহের ডান দিকটা অবশ হয়ে যায়, এমনকি কিছুদিনের জন্য কথা বলার ক্ষমতাও তিনি হারিয়ে ফেলেন। লেনিন বুঝতে পারছিলেন, তাঁর হাতে আর সময় বেশি নেই। ১৯২৩ সালের শেষের দিকে রচিত হয় তাঁর বিখ্যাত 'শেষ লেখা'—রাষ্ট্র ও পার্টির বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর ছোট ছোট রচনার সমষ্টি—নিকোলাই বুখারিন যাকে বলেছিলেন 'লেনিনের শেষ টেস্টামেট'। এই লেখাগুলোর অধিকাংশ লেনিন স্বহস্তে লিখে যেতে পারেননি, মুখে বলেছেন। তাঁর একান্ত সচিব লিদিয়া ফতিয়েভা তা বিশ্বস্ততার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এসব লেখায় রাষ্ট্র ও পার্টির সংস্কার নিয়ে পর্যালোচনা রয়েছে, এমনকি পার্টির নেতৃস্থানীয় কমরেডদের সবলতা-দুর্বলতা নিয়ে মন্তব্য স্থান পেয়েছে। তবে লেখাগুলোতে লেনিনের চিন্তাভাবনা

'রক্তাক্ত রবিবার'-এর অসফল অভ্যুত্থান, ১৯০৫

অনেকটা 'থিসিসধর্মী', অর্থাৎ সবিস্তারে ব্যাখ্যা-বিবরণীর অবকাশ পায়নি অনেক প্রসঙ্গ। তার পরও অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের কথা মনে রেখে লেনিন সমাজতন্ত্রের অর্থনীতি, রাষ্ট্র ও সমাজ নিয়ে কয়েকটি মূল প্রশ্ন উপস্থাপন করেছিলেন—যাতে করে আগামী দিনের বামপন্থীদের পক্ষে এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা সহজ হয়। তবে 'এক দেশে সমাজতন্ত্র গড়ার' ক্ষেত্রে অনিবার্যভাবে যেসব তত্ত্বগত প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছিল রাশিয়ার বামপন্থীদের, সবচেয়ে বড় সমস্যা তা ছিল না কখনোই। ভুলভ্রান্তি হলে আলোচনা-তর্কবিতর্ক করে একসময় তা সুরাহা করা যাবে—লেনিনের এই আস্থাবোধ সেদিন যেমন, আজও তা প্রাসঙ্গিক বলে মনে হবে। কিন্তু লেনিনের সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছিল তত্ত্বের ক্ষেত্রে নয়, তাঁর মৃত্যুর আগে পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচনের ক্ষেত্রে।

লেনিনের স্ট্রোক হয়েছিল ১৯২২ সালের মে মাসে। এর ঠিক এক মাস আগে স্তালিন সোভিয়েত পার্টির প্রথম 'সাধারণ সম্পাদক' হলেন। তখনো পর্যন্ত এ রকম কোনো পদের অস্তিত্ব ছিল না। লেনিন ছিলেন সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রধান—তিনি

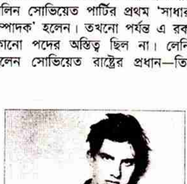

ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কি

কখনো 'সাধারণ সম্পাদক' ছিলেন না। অন্যদিকে, পার্টির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা ছিল পলিটব্যুরো। লেনিনের সময়ে পাঁচ সদস্যের পলিটব্যুরো উদ্ভাবন করা হয়। ১৯১৯ সালের পলিটব্যুরোতে সদস্য ছিলেন—লেনিন, লেয়ন ত্রৎস্কি, লেভ কামেনেভ, স্তালিন ও ক্রেসনিৎস্কি। পরবর্তী সময়ে পলিটব্যুরোর সম্প্রসারণ হলে এতে যোগ দেন গ্রিগোরি জিনোভিয়েভ, বুখারিন, পিতাকভ ও রাদেক। এঁদের মধ্যে স্তালিন ছিলেন জর্জীয়, লেনিন ও বুখারিন রুশি; এ ছাড়া আর সবাই ইহুদি। চেকার প্রধান দেঝেরঝিনস্কি ছিলেন পোলিশ, তবে তিনি পলিটব্যুরোর মধ্যে ছিলেন না। তার পরও এঁদের সবার মধ্যে থেকে স্তালিনকেই কেন বেছে নেওয়া হয়েছিল 'প্রথম সাধারণ সম্পাদক' হিসেবে, এ নিয়ে নানা মত রয়েছে।

একটি প্রবল মত রয়েছে যে, লেনিন প্রথমে এই প্রস্তাবটি দিয়েছিলেন ত্রৎস্কিকেই। বাজানভ ছিলেন ওই সময় পলিটব্যুরোর সচিবের দায়িত্বে, তাঁর কাজ ছিল সভার বিবরণীর নথিপত্র তৈরি করা। ১৯২৩ সালের ২৩ অক্টোবর বাজানভ এমনই একটি সভার বিবরণী নিচ্ছিলেন। লেনিনের মৃত্যুর তিন মাস আগে অনুষ্ঠিত সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রৎস্কি, স্তালিন এবং আরও কেউ কেউ। বাজানভের তথ্য অনুসারে, ত্রৎস্কিকে লেনিন এই প্রস্তাব দিলে তিনি তা ফিরিয়ে দেন। তাঁর যুক্তি ছিল, যেহেতু তিনি ইহুদি, তিনি চান না ঘরে-বাইরে বিপ্লবের শত্রুরা এ কথা বলার সুযোগ পাক যে সোভিয়েত দেশটা শাসন করছে আসলেই ইহুদিরাই। 'আরও ভালো হয়, যদি একজনও ইহুদি সোভিয়েত সরকারের সম্মুখ সারিতে না থাকে,' এই ছিল ত্রৎস্কির অভিমত। লেনিন যে ত্রৎস্কিকে তাঁর ডেপুটি হিসেবে প্রস্তাব করতে পারেন, সেটা অপ্রত্যাশিত ছিল না। লেনিনের পরপরই যাঁর নাম ১৯১৭-২৪ পর্বে উচ্চারিত হতো তিনি ছিলেন ত্রৎস্কি। তাত্ত্বিক, বাগ্মী ও সংগঠক হিসেবে খ্যাতি ছিল তাঁর। গৃহযুদ্ধ চলাকালে রেড আর্মির দেখভাল করার মূল পার্টিগত দায়িত্ব ছিল তাঁরই ওপর। জন রিডের *দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন* থেকে জানা যাচ্ছে, বিপ্লবের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরপর জনতার ঢল নামত লেনিনের পাশাপাশি ত্রৎস্কিকে একনজর দেখার জন্য। বুখারিন এই দুজনের তুলনায় ছিলেন বয়সে নবীন। 'তরুণ তাত্ত্বিক'—এই মর্মে লেনিন অভিহিত করেছিলেন তাঁকে। স্তালিন ছিলেন পার্টি-সংগঠনের দায়িত্বে। বিপ্লবের প্রথম পাঁচ বছরে তাঁর জনপরিচিতি ছিল তুলনামূলকভাবে কম।

এটা ঠিক যে, ত্রৎস্কি সম্পর্কে লেনিনের মূল্যায়নে স্পষ্ট ভাষণ ছিল না কংগ্রেসের কাছে লেখা শেষ চিঠিতে। লেনিন লিখেছেন, ত্রৎস্কি হচ্ছেন 'আমাদের পার্টির মধ্যে একজন নন-বলশেভিক'। এর ব্যাখ্যা এই নয় যে তিনি ছিলেন অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। নির্ভরযোগ্যতা না থাকলে বিপ্লবের পরপর রেড আর্মির মূল দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হতো না। কেউ কেউ—যেমন আখমাতভার জীবনীকার, কবি ও অনুবাদক অ্যালেইন ফেইনস্টেইন—এ কথা বলার প্রয়াস পেয়েছেন যে স্তালিনের তুলনায় ত্রৎস্কি ছিলেন অনেক বেশি বুদ্ধিজীবী গোছের। ফেইনস্টেইনও বাজানভের মতো মনে করেছেন, ত্রৎস্কি ইহুদি ছিলেন বলে 'অর্থডক্স চার্চের অনুসারী' সংখ্যাগরিষ্ঠ রুশি জনগণের কাছে হয়তো ততটা গ্রহণযোগ্য হতেন না। তবে লেনিনের কাছে কে কোন ধর্মে বা জাতিসত্তায় জন্মগ্রহণ করেছেন, সেটা সবচেয়ে বড় যুক্তি হিসেবে কখনোই গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। লেনিনের সামান্য যে কয়েকটি রেডিও-বক্তৃতার রেকর্ড এখনো সংরক্ষিত আছে, তার মধ্যে একটি ছিল ইহুদিবিদ্বেষী অ্যান্টিসেমিটিক মনোভাবের সমালোচনা করে রাখা বক্তব্য। হতে পারে, লেনিন ত্রৎস্কিকে স্বীয় মতের প্রতি অতিরিক্ত আস্থাবান মনে করেছিলেন। কেবল নিজের বিচারবুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বকে প্রাধান্য দিতে গেলে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে পার্টির জন্য হঠকারী পদক্ষেপও নিয়ে ফেলতে পারেন ত্রৎস্কি—এ রকম আশঙ্কা করে থাকবেন লেনিন। 'পারমানেন্ট রেভোল্যুশন'-এর প্রবক্তা হিসেবে 'এক দেশে সমাজতন্ত্র গড়ার' প্রকল্পকে তিনি খাটো করে দেখতে পারেন, এ রকম কোনো প্রবণতা লেনিন ত্রৎস্কির মধ্যে শনাক্ত করে থাকবেন। বিপরীতে, স্তালিনের খ্যাতি ছিল পরিশ্রমী পার্টি সংগঠক হিসেবে। সেমিনারিস্ট ছিলেন তিনি—এ যুগের ভাষায় বললে, মাদ্রাসার ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে পা রাখার সুযোগ হয়নি তাঁর। স্তালিন ছিলেন মূলত স্বশিক্ষিত বিপ্লবী, তবে খুব দ্রুতই সবকিছু শিখতে পারতেন। ধর্মতত্ত্বের পাশাপাশি দর্শন ও সাহিত্যে তাঁর পড়াশোনা ছিল। সিমোন মন্তেফিওরে সাধারণত স্তালিন সম্পর্কে নেতিবাচক ধারায় 'বেস্টসেলার' ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনিও স্বীকার করেছেন যে সমসাময়িক সাহিত্যপাঠে স্তালিনের জুড়ি ছিল না। ইলিয়া এরেনবুর্গও তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন যে, দিনে তিন-চার শর মতো পাতা পড়তে পারতেন স্তালিন। কে কোন সাহিত্য-সাময়িকীতে কী নিয়ে লিখছেন তার খবর রাখতেন। প্রয়োজনে এরেনবুর্গ, আলেকসান্দর ফাদায়েভ বা পাস্তেরনাককে জিজ্ঞেস করে কোনো লেখক সম্পর্কে মতামত নিতেন। তার পরও অহেতুক বুদ্ধিজীবীসুলভ জ্ঞানগরিমা তাঁর মধ্যে কখনো প্রকাশ পায়নি। হতে পারে, লেনিন স্তালিনের চরিত্রের এই দিকটির কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলেন।

তা ছাড়া তাঁর সঙ্গে যাঁরা দেখা করতে যেতেন, তাঁদের মুগ্ধ করার এক বিস্ময়কর ক্ষমতা ছিল স্তালিনের। রোমাঁ রোলাঁ, এইচ জি ওয়েলস, জর্জ বার্নার্ড শ পরবর্তী সময়ে যখন স্তালিনের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাতে মিলিত হয়েছিলেন, তাঁরা সবাই মুগ্ধ হয়েছিলেন এই সোভিয়েত নেতার সহজ নিরহংকার ব্যবহারে। হতে পারে, এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে ত্রৎস্কির চেয়ে স্তালিন আরও বেশি মনোযোগী হবেন তাঁর কমরেডদের মতামতের প্রতি—এমনটা সেদিন লেনিনের মনে হয়েছিল। হঠকারী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য যে প্রবল আত্মবিশ্বাস ও প্রচুর জনপ্রিয়তার ভিত্তি লাগে সে সম্ভাবনাও তুলনামূলকভাবে কম ছিল স্তালিনের। কেননা নিজের বুদ্ধিকে যেমন তিনি আড়ালে রাখতেন, পার্টির কাজের মধ্যে নিজেকেও তিনি নিভৃত ভূমিকায় রাখতেই ভালোবাসতেন। ত্রৎস্কি যেমন বক্তৃতা দেওয়ার সময় গ্রিক রেটোরিকসের সব কলা আয়ত্ত করে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন শ্রোতাদের, স্তালিন সে তুলনায় কথা বলতেন নিচু স্বরে—তাঁর জর্জীয় উচ্চারণে রুশ শব্দ একটু ভিন্ন স্বাদের আমেজ এনে দিত। প্রতিটা শব্দ তিনি বলতেন প্রায় ওজন করে করে। নিভৃতের মানুষ তিনি এবং সে অর্থে সাধারণ আমজনতার মতোই মানুষ—এই ইমেজটাই স্তালিন আজীবন বাইরে লালন করেছেন। হয়তো এসব বিবেচনায় ত্রৎস্কির তুলনায় বৌদ্ধিক প্রতিভায় 'মাঝারি মানের' মনে হলেও স্তালিনকে 'প্রথম সাধারণ সম্পাদক' পদে গ্রহণ করতে লেনিনের বাধেনি। তা ছাড়া, আরেকটি আদর্শিক বিবেচনাও তাঁকে প্রভাবিত করে থাকবে। আদর্শগত বিতর্কে স্তালিন সব সময়ই 'মধ্যপন্থা' খুঁজেছেন। ত্রৎস্কির মতো 'সারা বিশ্বে এখনই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছাড়িয়ে দিতে হবে', এটা যেমন তিনি চাননি, আবার 'উন্নত পুঁজিবাদী দেশে বিপ্লব না এলে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র গড়া যাবে না' কাউৎস্কি-প্লেখানভের মতো এ রকম হতাশাবাদেও তিনি আত্মসমর্পণ করেননি। 'এক দেশেই সমাজতন্ত্র গড়া সম্ভব'—১৯১৭ সালের আগেপরে লেনিনের এই মুখ্য থিসিসে স্তালিন নিষ্কম্প্রভাবে আস্থাশীল ছিলেন বরাবর। 'লেনিনবাদ' শব্দটাও পরবর্তী সময়ে তাঁরই চয়ন করা।

ইলিয়া এরেনবুর্গ

কিন্তু প্রাথমিকভাবে স্তালিনকে সমর্থন দিলেও অচিরেই লেনিনের ভুল ভেঙে যায়। বিশেষ করে লেনিনের পত্নী নাদিয়েঝদা ক্রুপস্কায়ার সঙ্গে দুর্ব্যবহারের ঘটনার কথা শুনে তিনি রীতিমতো বিচলিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু সাধারণ সম্পাদকের পদে স্তালিনকে বসানোর কাজটা যেহেতু তাঁর সিদ্ধান্তের অমতে হয়নি, এখন তাঁকে ওই পদ থেকে সহসা সরাতে গেলে অনেক প্রশ্ন উঠতে পারে, পার্টির ভেতরে ও বাইরে। সুতরাং স্তালিনকে সরানোর কাজটা করতে হবে একটু সময় নিয়েই। আরও ভালো হয়, যদি এ কাজটা করা যায় পরবর্তী (ত্রয়োদশ) কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন ডেকে। স্ট্রোকের পর যে কয় মাস বেঁচে ছিলেন লেনিন, তিনি যতটা যুদ্ধ করছিলেন অসুখের সঙ্গে, তার চেয়েও বেশি করছিলেন এক অজানা আশঙ্কার সঙ্গে। সহকর্মীরা তাঁর অবর্তমানে বিভক্ত হয়ে যাবে দুই যুযুধান শিবিরে, হয়তো জড়িয়ে পড়বে কোনো রক্তাক্ত ভ্রাতৃদ্রোহী যুদ্ধে, যেমনটা ঘটেছিল ফরাসি বিপ্লবের পর। রবেসপিয়ার ও দান্তনের মধ্যে ফাটল ধরার কারণে শুধু যে দান্তনকে গিলোটিনে প্রাণ দিতে হয়েছিল, তা-ই নয়, রবেসপিয়ারকেও একই পরিণতির শিকার হতে হয়। অসুখে থাকার নিঃসঙ্গ প্রহরগুলোয় লেনিন 'শেষ চিঠি'র প্রতিটা শব্দচয়ন নিয়ে ভেবেছেন, কেননা এ চিঠিতে পলিটব্যুরোর প্রতিটা সদস্যের ব্যক্তিগত মূল্যায়ন থাকছে। ব্যক্তিগত বিচার বলেই এখানে ইচ্ছা করেই রেখে দিতে হচ্ছে কিছুটা অস্পষ্টতা, কিছুটা নমনীয়তা ও কিছুটা অর্থদ্বৈধতা। এভাবেই ১৩তম পার্টি কংগ্রেসকে উদ্দেশ করে লেখা হয়েছে 'কংগ্রেসের কাছে খোলা চিঠি'। চিঠিটা লেখা লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ মাত্র—আসল কথাটা বলা হচ্ছে পাদটীকায় এসে। এই পাদটীকাতেই লেনিন বলবেন সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে স্তালিনকে সরিয়ে দেওয়ার কথা।

এখন আমরা জানি, কংগ্রেসের কাছে লেখা লেনিনের 'খোলা চিঠি' ত্রয়োদশ কংগ্রেসে খোলা হবে না। কংগ্রেসের সাধারণ ডেলিগেটরা জানতেই পারবেন না এ চিঠির অস্তিত্ব। এটি পড়া হবে না আরও ৩২ বছর। স্তালিনের মৃত্যুর পরে—নির্দিষ্ট করে বললে, তাঁর মৃত্যুর তিন বছর পরে—কেবল ১৯৫৬ সালে বিশতম কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে এ চিঠি পড়া হবে। ১৯২৪ সালে যদি চিঠিটা পড়া হতো, ইতিহাস তার পরও অন্য ধারায় অগ্রসর হতো কি না সে নিয়ে সংশয় রয়েছে। পড়া তো হয়েছিল তখনই—যদিও কংগ্রেসের মধ্যে নয়, পলিটব্যুরোর বর্ধিত সভায়। সেখানে দাঁড়িয়ে স্তালিন স্বীকার করলেন, লেনিন তাঁর যেসব ত্রুটির কথা চিঠিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেনিনের সঙ্গে স্ত্রী নাদিয়েঝদা ক্রুপস্কায়া, ১৯২২

উল্লেখ করেছেন—তার সবই সত্য পর্যবেক্ষণ। সেই সঙ্গে যোগ করলেন প্রথম স্তালিনীয় আপ্তবাক্য—'তিনি ভুল করতে পারেন', কিন্তু 'লেনিন ভুল করতে পারেন না', কেননা 'লেনিনবাদ হচ্ছে এ যুগের মার্ক্সবাদ'। ক্রুপস্কায়ার কাছে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমাও চাইলেন তাঁর দুর্ব্যবহারের জন্য। কমরেডদের বললেন তাঁকে আরও কিছুটা সময় দিতে, কেননা এসব চারিত্রিক ত্রুটি শুধরে নিতে সময় লাগবে কিছুটা। তত দিন পর্যন্ত কমরেডরা একটু ধৈর্য ধরবেন, এই আশা করছেন স্তালিন। তবে অতীতের ত্রুটি যা-ই হোক, পার্টি ও রাষ্ট্রকে শত্রুমুক্ত রাখাই হবে তাঁর প্রধান লক্ষ্য। সমাজতন্ত্রের যে পতাকা লেনিন তাঁদের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন, তা তিনি কখনোই ছাড়বেন না। লেনিনের জন্য তৈরি হতে হবে মসোলেয়াম—সেখানে মমি করে রাখা হবে লেনিনের মরদেহ। এটা করতে হবে কেননা মায়াকোভস্কির মতো তিনিও মনে করেন, 'লেনিন জীবিত ছিলেন, লেনিন জীবিত আছেন, লেনিন জীবিত থাকবেন।' মায়াকোভস্কিকে সোভিয়েত যুগের 'শ্রেষ্ঠতম কবি' আখ্যা দিয়েছিলেন স্তালিন পরবর্তীকালে। ১৯৩০ সালে মায়াকোভস্কির আত্মহত্যা স্তালিনের এই মূল্যায়নে কোনো পরিবর্তন আনেনি। শাস্তি হবে কি, স্তালিনের এই বক্তৃতায় বর্ধিত পলিটব্যুরোর সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা প্রায় সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা প্রায় সবাই ভেবেছেন—না, এই বিনীত জর্জিয়ান কমরেডের ওপর আস্থা রাখা যায়। লেনিন হয়তো তাঁর মূল্যায়নে কিছুটা বেশিই কঠোর হয়ে পড়েছেন। দেশ-জাতির এই দুর্দিনে এমন শক্ত মনোবলের লোকই দরকার। কেউ কেউ হয়তো অতটা চমৎকৃত হননি, কিন্তু তাঁরাও স্তালিনের বক্তৃতার পরে সভার মেজাজ বুঝে চুপ হয়ে গেলেন।

লেনিনের জীবনাবসান হলো ১৯২৪ সালের ২১ জানুয়ারি। সবকিছু সঠিক ধারায় রেখে যেতে পারলেন কি না, এমন একটা উদ্বেগ মনের মধ্যে নিয়েই তিনি মারা গেলেন। লেনিনের জন্য যা ছিল উদ্বেগ, তা বাস্তব শঙ্কায় পরিণত হলো ১৯২০-এর দশক না পেরুতেই। প্রথমে ত্রৎস্কির রাজনৈতিক লাইনের বিরুদ্ধে স্তালিনের সঙ্গে হাত মেলালেন জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ। ত্রৎস্কি ১৯২৮ সালে পার্টিবিরোধী কার্যক্রমের জন্য বহিষ্কৃত হলেন। ১৯২৯ সালে তাঁকে বহিষ্কার করা হলো সোভিয়েত দেশ থেকেই। ১৯৩০-এর দশকে আবার জিনোভিয়েভ-কামেনেভ লাইনের বিরুদ্ধে স্তালিনের সঙ্গে হাত মেলালেন বুখারিন। ১৯৩৪ সালে অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে নিহত হলেন লেনিনগ্রাদ পার্টির সেক্রেটারি সের্গেই কিরভ। এর সূত্র ধরে পার্টির ভেতরে ও বাইরে গোটা দেশব্যাপী শুরু হলো শুদ্ধি অভিযান। প্রথমে গ্রেপ্তার হলেন জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ। পরে গ্রেপ্তার হলেন স্তালিনের একসময়ের মিত্র বুখারিন—তিনি তখন ছিলেন পার্টির প্রধান মুখপত্র *প্রাভদার* সম্পাদক। কতটা দ্রুত শিল্পায়ন করতে হবে এবং কতটা দ্রুত কালেক্টিভাইজেশন বা কৃষির সমবায়ীকরণ করতে হবে—এসব প্রশ্নে বুখারিন 'ধীরে চলো' নীতির পক্ষে ছিলেন। লেনিনের পলিটব্যুরোর ও কেন্দ্রীয় কমিটির অন্য সদস্যরা—রাদেক, পিতাকভ, রুদজুতাক—প্রায় কেউই বাদ গেলেন না এই শুদ্ধি অভিযান থেকে। বাইরে থাকলেন কেবল গোর্কি ও লেনিনের পত্নী ক্রুপস্কায়া। কিন্তু ১৯৩০-এর দশকে পার্টি ও রাষ্ট্রের ওপর তাঁদের প্রভাব ক্রমেই সীমিত হয়ে আসছিল। কামেনেভকে বাঁচানোর জন্য ক্রুপস্কায়া গিয়েছিলেন স্তালিনের কাছে। অনুনয় আবেদনে কোনো কাজ হলো না। স্তালিন স্থির রইলেন তাঁর সিদ্ধান্তে। ক্রুপস্কায়া ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, 'আমি পার্টির সবাইকে এ নিয়ে চিঠি লিখব।' কথিত আছে, স্তালিন এ কথা শুনে বলেছিলেন, 'আপনি সে রকম পদক্ষেপ নিলে পার্টিও বসে থাকবে না। পার্টিও তাহলে নতুন দলিলপত্র পেশ করে প্রমাণ করবে যে লেনিনের বিধবা স্ত্রী আসলে আপনি নন। প্রকৃত স্ত্রী হচ্ছেন স্তাসভা, যিনি ১৯০৩ সাল থেকে পার্টির সঙ্গে জড়িত আছেন। আপনি ভাবছেন, পার্টি এ কথা প্রমাণ করতে পারবে না? পার্টি অবশ্যই পারবে, পার্টি চাইলে সবই পারে।' গোর্কি তত দিনে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ক্রুপস্কায়ার সামনে পরাজয় মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না।

কী লিখেছেন লেনিন 'কংগ্রেসের কাছে লেখা চিঠি'র পাদটীকায়? সামান্য তিন-চারটি লাইনে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন আসলে কী ধরনের পরিবর্তন চান তিনি। কথাগুলো ছিল মোটামুটি এ রকম: 'পার্টির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে স্তালিন অপরিমিত ক্ষমতা নিজের হাতে কুক্ষিগত করেছেন। [কংগ্রেসের] উচিত হবে, তাঁর পরিবর্তে এমন কাউকে নির্বাচিত করা যিনি হবেন গুণাবলিতে তাঁর সমকক্ষ, তবে আরও বেশি কিছু বৈশিষ্ট্য তাঁর থাকতে হবে। আচার-ব্যবহারের দিক থেকে তিনি স্তালিনের চেয়ে অনেক বেশি শ্রদ্ধাশীল, অনুগত ও সৌজন্যপরায়ণ হবেন—বিশেষ করে তাঁর কমরেডদের প্রতি।' এর চেয়ে বেশি কিছু দাবি করেননি সেদিন লেনিন। তত্ত্বদর্শিতা নয়, তত্ত্ব বাস্তবায়নে অসাধারণ কোনো ক্ষমতা নয়, জীবনের শেষ চিঠিতে লেনিন সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নেতাদের কাছে কিছু সাধারণ (নাকি বিরল?) মানবিক গুণাবলি—যেমন কমরেডদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, আনুগত্য ও সৌজন্যপরায়ণতা—প্রত্যাশা করেছিলেন মাত্র। এর মধ্য দিয়ে হয়তো এক মানবিক সমাজতান্ত্রিক নেতৃত্ব গড়ে উঠবে, এ রকম আশা ছিল তাঁর।

তবে বাস্তবতা ছিল আরও বিষণ্ন। তিরিশের দশকের শুদ্ধি অভিযানের আগুনে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলেন সোভিয়েত পার্টির, এমনকি কমিন্টার্নের অনেক নিষ্ঠাবান বামপন্থী নেতা-কর্মী। ১৯৩৪ সালের ১৭তম কংগ্রেসের ১৯৬ জন ডেলিগেটের দুই-তৃতীয়াংশই মৃত্যুবরণ করেছেন এসব শুদ্ধি অভিযানে। ১৩৯ জনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যের ৯৮ জনই ১৯৩৪-১৯৩৮ সালের মধ্যেকার শুদ্ধি অভিযানে মারা গেছেন। এই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ ছিল ১৯১৮-২০ সালের গৃহযুদ্ধের চেয়েও নির্মম। আন্না আখমাতভা তাই চল্লিশের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ৎসারস্কোয়ে সেলো লাইসিয়াম : একসময় এতে পড়েছেন আলেকসান্দর পুশকিন, আরও পরে গুমিলিয়ভ ও মান্দেলস্তাম

দশকের শুরুতে এই শুদ্ধি অভিযানের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে অনায়াসে লিখতে পেরেছিলেন, 'এটা হচ্ছে সেই সময় যখন মৃতেরাই কেবল সুখে হাসতে পারত, শেষ পর্যন্ত নিষ্কৃতি মিলেছে—এই বোধে।'

আখমাতভা এর কিছুদিন পরই লিখবেন তাঁর কবিতা 'যে কবিতার কোনো নায়ক নেই'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এটা লেখা হবে। এ যুদ্ধের কোনো 'নায়ক নেই'—এটা বললে স্তালিনের ভূমিকাকে কিছুটা খাটো করা হয়। আখমাতভা অবশ্য বলতে চেয়েছিলেন, এই যুদ্ধের 'বিশেষ' নায়ক নেই, এখানে যারা অংশ নিয়েছে—যার মধ্যে কবি হিসেবে তিনি নিজে ও লেনিনগ্রাদের অবরোধ নিয়ে রচিত বিখ্যাত সপ্তম সিম্ফনির সুরকার দমিত্রি শস্তাকোভিচও পড়েন—তাঁরা সবাই বিভিন্ন পেশার মানুষ। কিন্তু কবিতাটির মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ক্রিটিক ছিল চলতি পার্টিতন্ত্রের এবং শুধু সে কারণেই পুরো কবিতাটি কখনোই প্রকাশ পায়নি স্তালিনের জীবদ্দশায়। এ রকমই আরেকটি কবিতা ছিল আখমাতভার 'রেকুইম' ('শোকগাথা')। এটা লেখা হয়েছিল শুদ্ধি অভিযানে হারিয়ে যাওয়া লোকেদের স্মরণে। 'লেখা' বললে কিছুটা ভুল বলা হয়, কেননা কবিতাটি স্তালিনের জীবদ্দশায় কোথাও ছাপা হয়নি, এমনকি কোনো লিখিত পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায়নি 'রেকুইম'-এর। লেখার পর এর পঙ্‌ক্তিগুলোকে কয়েকজনে মিলে মুখস্থ করা হয়েছিল। সাহিত্য-সমালোচক কর্নেই চুকোভ্‌স্কির মেয়ে লেখিকা লিদিয়া চুকোভ্‌স্কায়ার স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়, আন্না ও তিনি নিজে কবিতাটির প্রতিটা পঙ্‌ক্তি ধরে ধরে মুখস্থ করেছিলেন। বহু বছর পর্যন্ত কবিতাটি সংরক্ষিত ছিল কেবল কিছু মানুষের স্মৃতিলোকে। মান্দেলস্তাম, আখমাতভা বা মারিনা সিভেতায়েভার বহু কবিতা টিকে ছিল এভাবেই। প্রজন্ম-পরম্পরায় মুখস্থ করে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল এগুলো, যেভাবে কাজ করে প্রাচীন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে মৌখিক ঐতিহ্য লালিত ইতিহাস, কিংবদন্তি ও প্রবাদ-প্রবচন।

মান্দেলস্তাম যে বিতর্কিত কবিতাটির জন্য শেষ পর্যন্ত মারা গেলেন বন্দিশিবিরে, সেটিও এভাবেই বেঁচে ছিল অনেক দিন। কিন্তু দুর্ভাগ্য কবির। কোনো এক সান্ধ্য ঘরোয়া আসরে শ্রোতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের একজন অনুচর। এসব অনুচর সে সময় সর্বত্র বিচরণ করে বেড়াতেন হরিৎ উদ্ভিদের মধ্যে মিশে থাকা সবুজ লতা হেন সর্পের মতো। ওই সান্ধ্য আসরের পরপরই খুব দ্রুত গ্রেপ্তার হয়ে কিছুকালের মধ্যেই ভরকুতার (গুলাগ) বন্দিশিবিরে হারিয়ে গেলেন মান্দেলস্তাম।

নিকোলাই গুমিলিয়ভ ১৮৮৬-১৯২১

স্তালিনীয় শুদ্ধি অভিযানের ঝড় উঠেছিল তিরিশের দশকে। সুনির্দিষ্ট করে বললে, ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮ এই পাঁচ বছরে শুদ্ধি অভিযান চরমে পৌঁছেছিল। এই ঝড়ে মান্দেলস্তামের পরিণতি নিয়ে তার পত্নী নাদিয়েঝদা মান্দেলস্তামের স্মৃতিকথা প্রায় তিরিশ বছর লোকচক্ষুর আড়ালে থাকার পর ১৯৭৫ সালে *হোপ অ্যাগেইনস্ট হোপ* নামে পাশ্চাত্যে প্রকাশিত হয়। সে বইয়ে নাদিয়েঝদা লিখেছেন, 'মান্দেলস্তামের কবিতা ছিল এমনই বিপজ্জনক যে সেসব লাইনের যাঁরা ছিলেন প্রথমবারের শ্রোতা, তাঁদেরও সবারই ট্র্যাজিক পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।' অথচ প্রথাগত অর্থে 'রাজনৈতিক কবিতা' লিখতেন না মান্দেলস্তাম। তার পরও কেন যে তিনি স্তালিনকে নিয়ে প্রতিবাদী কবিতা লিখতে গেলেন; আর লিখলেনই যদি, কেনই বা স্তালিনের গোঁফজোড়াকে তার মনে হলো 'তেলাপোকার দুই শুঁড়'—সেটা এখন মনে হয় প্রায় অবিশ্বাস্য এক কাহিনি। তাঁর সমবয়সী বন্ধু নিকোলাই গুমিলিয়ভের মতো তিনি বিশ্বাস করতেন 'আকমেইজম' নামক শিল্পকলার আন্দোলনে। প্রতীকবাদী কবিতার বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ ছিল যে এসব কবিতা বাস্তবের থেকে দূরে সরে গেছে। আকমেইস্তরা জীবন থেকে তুলে আনা বাস্তব চিত্রকল্প ব্যবহার করতেন। এঁদের আরেকটা বিশ্বাস ছিল যে যন্ত্রপ্রকৌশল শিখে যেমন প্রকৌশলী হওয়া যায়, তেমনি কবিতার 'কোর্স' করে হওয়া সম্ভব একজন সফল কবি। রাজনীতি কখনোই আকমেইজম আন্দোলনের জন্য জরুরি কোনো বিষয় ছিল না।

গুমিলিয়ভ ও মান্দেলস্তাম উভয়েই পড়েছেন পিটার্সবুর্গের সবচেয়ে এলিট স্কুল ৎসারস্কোয়ে সেলো লাইসিয়ামে। এখান থেকেই একসময় স্কুলের পড়ালেখা শেষ করেছিলেন রুশ কবি পুশকিন। এই স্কুল থেকে যারা বেরোত, তারা ভবিষ্যতে ইম্পিরিয়ল সার্ভিসে যোগ দেবে, সেটাই ছিল প্রত্যাশিত। ঠিক সেভাবেই গুমিলিয়ভও জারের ইম্পিরিয়ল বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধে। ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবকে মেনে নেননি গুমিলিয়ভ; কিন্তু সাদাদের বাহিনী না লালদের বাহিনী জিতল, তা নিয়ে কোনো ব্যক্তিগত দুর্ভাবনা ছিল না তাঁর। তিনি নিজে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করতেন প্রাচ্যদেশে, স্যার রিচার্ড বার্টনের মতো সহস্র আরব্য রজনীর অন্ধকারে, বিশেষত তাঁর আকর্ষণ ছিল পারস্য সাম্রাজ্য ও আফ্রিকার প্রতি। তাঁর এই এথনোগ্রাফিক উৎসাহ কোনো রহস্যময় জেনেটিক কোডে পরবর্তী সময়ে সঞ্চারিত হয় তাঁর ছেলে প্রাচ্যবিদ লেভ গুমিলিয়ভের মধ্যে। ১৯১৮ সালে গোর্কির আমন্ত্রণে তিনি 'বিশ্বসাহিত্য' প্রকল্পে কাজ শুরু করেন। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল, রুশ সাহিত্যের বাইরের মণি-মুক্তা অনুবাদ করে দ্রুত স্থানীয় পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। গুমিলিয়ভের সঙ্গে এই প্রকল্পে কাজ করেছেন কবি আলেকসান্দর ব্লক, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি ও রাজনৈতিক স্যাটায়ারের রচয়িতা ইয়েভগেনি জামিয়াতিনের মতো খ্যাতনামা লেখকেরা। অল্প বয়সেই গুমিলিয়ভের কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল বলেই গোর্কি তাঁর প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তবে গুমিলিয়ভ আরও নানা কারণে বিশিষ্ট ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধে জার আর্মির অফিসার হিসেবে বীরত্বের জন্য তিনি দুবার পুরস্কৃত হয়েছিলেন। *অশ্বারোহীর স্মৃতিচারণা* বইটিতে তিনি তাঁর সে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের বিপ্লবে কেরিনস্কির অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় তিনি ফ্রান্সে প্রেরিত হন 'বিশেষ দূত' হিসেবে। এক হিসেবে অক্টোবর বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় তাঁর ফেরারই কথা নয়। কেন ফিরে এলেন তার একটি ছোট্ট বর্ণনা পাওয়া যায় গিওর্গি ইভানভের *চায়নিজ শ্যাডোজ* বইয়ে :

> আমরা রাশান ইম্পিরিয়ল আর্মির বেশ কজন অফিসার ঘটনাক্রমে লন্ডনের এক ক্যাফেতে মিলিত হয়েছিলাম। হঠাৎ করে প্রায় সবাই একযোগে বললাম, এখানে আমাদের করার আর কিছু নেই। কে কোথায় যাবে, সেটা ঠিক করতে লাগলাম। কেউ বলল, আফ্রিকা ভ্রমণে যাবে—সিংহ শিকারে। কেউ বলল, আবার প্রথম মহাযুদ্ধেই ফিরে যাবে—অন্য কোনো বিদেশি আর্মিতে যোগ দিয়ে। 'গুমিলিয়ভ, তোমার কী চিন্তা? তুমি কোথায় যাবে?' কবি তখন উত্তর দিলেন, 'আমি অনেক যুদ্ধ করেছি, আফ্রিকাতেও গেছি তিনবার। কিন্তু এখনো কোনো বলশেভিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। আমি রাশিয়াতেই ফিরে যাচ্ছি। সিংহ শিকারের চেয়ে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা কখনোই বেশি বিপজ্জনক হতে পারে না'।

১৯২১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ক্রনস্তাদের ঘাঁটিতে নৌবিদ্রোহ ছিল বলশেভিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এক বড় ধরনের প্রতিবিপ্লবী ঘটনা। ত্রৎস্কি স্বয়ং রেড আর্মির নেতৃত্ব দিয়ে এই বিদ্রোহ কঠোর হাতে দমন করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। লেনিনের চোখে নৌসেনাদের এ বিদ্রোহ ছিল ইউরোপীয় পুঁজিবাদী দেশগুলোর ও দেশের ভেতরের হোয়াইট আর্মির যৌথ উদ্যোগে প্ররোচিত এক ষড়যন্ত্র। এই বিদ্রোহের সমর্থক হিসেবে জড়ানো হয় কবি নিকোলাই গুমিলিয়ভকে। ১৯২১ সালের ২৪ আগস্ট আখমাতভার স্বামী কবি গুমিলিয়ভকে ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারা হয়। গুমিলিয়ভের বিখ্যাত কবিতাগুলো জীবজন্তু নিয়ে বা দেশে-বিদেশে ভ্রমণ নিয়ে। জিরাফ নিয়ে কবিতা লিখেছেন, যেমন লিখেছেন আসিরীয় সাম্রাজ্য নিয়ে। কালো মহাদেশের ঔপনিবেশিক পরিব্রাজকদের মতো গুমিলিয়ভ নানা রোমাঞ্চপূর্ণ অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। সেসব কাহিনির ছাপ পড়েছে তাঁর কবিতায়, স্মৃতিচারণায়। ইথিওপিয়ার লোকগীতি সংগ্রহ করেও একটি বই প্রকাশ করেছিলেন তিনি *বিদেশি আকাশের তলে* নাম দিয়ে। *ছোটদের আফ্রিকা* সম্পর্কে কাহিনিমালা লেখার জন্য এখনো তাঁকে স্মরণ করা হয়।

তাঁকে ফায়ারিং স্কোয়াড থেকে বাঁচানোর জন্য গোর্কি নানা জায়গায় তদবির করেছিলেন। কথিত আছে, শাস্তি থেকে অব্যাহতি-দানের তালিকা 'ওপর থেকে' নির্দেশিত হয়ে 'নিচে নামতে নামতে' গুমিলিয়ভের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ কার্যকর হয়ে যায়। এর ১৭ বছর পর ১৯৩৮ সালে সাইবেরিয়ার এক প্রত্যন্ত এলাকায় নির্বাসিত থাকা অবস্থায় মৃত্যু ঘটে নিকোলাই গুমিলিয়ভের বন্ধু মান্দেলস্তামের। অবশ্য গুমিলিয়ভের মতো ফায়ারিং স্কোয়াডে নয়—কিছুটা শোকে, কিছুটা অসুখে, কিছুটা ক্ষুধায় মারা যান তিনি—বারতিনেক আত্মহত্যার ব্যর্থ চেষ্টার পর। তাঁকে গুলাগ থেকে ছাড়িয়ে আনার তদবির করার মতো কেউ ছিলেন না সেদিন। বন্ধু মান্দেলস্তামকে নিয়ে পাস্তেরনাক সে সাহস করেননি। রাইটার্স ইউনিয়নের সেক্রেটারি আলেকসান্দর ফাদায়েভও নিশ্চুপ ছিলেন। এ অবস্থায় সাহস দেখাতে পারতেন একজনই—তিনি গোর্কি। কিন্তু এর দু বছর আগেই তিনি মারা গেছেন, দীর্ঘদিন অসুখে ভোগার পর।

ওসিপ মান্দেলস্তাম : ১৯৩৪

১৯৩৪ সালের মে মাসে মান্দেলস্তাম ও তাঁর পত্নী নাদিয়েঝদার মস্কোর ফ্ল্যাটে বেড়াতে এসেছেন আখমাতভা। আন্না এলে মান্দেলস্তামের উচ্ছ্বাস বেড়ে যায়। গত বছর যখন আন্না এসেছিলেন তাঁরা দুজনে মিলে মূল ইতালীয় ভাষায় পাঠ করেছেন দান্তের *ডিভাইন কমেডি*। পড়তে পড়তে একপর্যায়ে 'পার্গেটরি' (যেখানে শাস্তি দেওয়া হয় পাপীদের) অংশটি যখন আন্না আবৃত্তি করছিলেন, ওসিপ তাঁর কান্না

কথা বলছেন স্তালিন ও মাক্সিম গোর্কি, ১৯৩১

থামিয়ে রাখতে পারেননি। দান্তের প্রতি প্রবলভাবে অনুরক্ত দুজনই। 'দান্তের সঙ্গে কথোপকথন' নামে একটি গদ্যরচনাও এরই মধ্যে লিখে ফেলেছেন মান্দেলস্তাম। শুধু স্বামী গুমিলিয়ভের বন্ধু হিসেবে নয়, নিজ গুণেই ওসিপের সঙ্গে আন্নার বন্ধুত্ব আরও ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল তিরিশের দশকে। এ সময় আন্নার ছেলে লেভ গুমিলিয়ভকে কেন্দ্র করে এ দুই পরিবারের মধ্যে যাওয়া-আসা আরও বেড়ে যেতে থাকে। ওসিপ ও নাদিয়েঝদার কোনো সন্তান নেই। নিকোলাই ও আন্নার সন্তান লেভ তাঁদের পুত্রতুল্য। একপর্যায়ে এতটাই তাঁরা পরস্পরের নিকটে চলে আসেন যে লেভ মাকে ছেড়ে মস্কোতেই মান্দেলস্তাম দম্পতির সঙ্গে বসবাস শুরু করে। ছেলেকে দেখতে মাঝেমধ্যেই লেনিনগ্রাদ (লেনিনের মৃত্যুর পরে পিটার্সবুর্গের নতুন নাম) থেকে ট্রেনে করে মস্কোয় চলে আসেন আন্না। এবারও সে কারণেই উঠেছেন মস্কোয়, মান্দেলস্তামের ছোট্ট ফ্ল্যাটটিতে।

নাদিয়েঝদা যে আন্নাকে খুব পছন্দ করতেন, তা কিন্তু নয়। আন্নার মধ্যে পারিপার্শ্বিকের সব মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠার একটা প্রবণতা ছিল। বিপ্লবপূর্ব কালের অভিজাত সমাজের আদব-কায়দা ছিল আন্নার সহজাত—যেন তিনি একাধারে কবি ও কবিতার সাম্রাজ্যের রাজমহিষী। মারিনা সিভেতায়েভা তাঁর এক কবিতায় যেমন বলেছিলেন, 'সারা রাশিয়ার আন্না তিনি'—যেন তিনি কবি নন, সারা রাশিয়ারই সম্রাজ্ঞী ('জারিনা')। একবার আন্না মান্দেলস্তামের বাসায় এসে কিছুদিন ছিলেন। ফিরে যাওয়ার দিন তাঁকে স্টেশনে তুলে দিতে গেল লেভ। সে সময় মান্দেলস্তাম মন্তব্য করেছিলেন, 'কী স্বস্তিই না লাগছে যে আন্না এখন বাসায় নেই। একটা ছোট্ট ফ্ল্যাটের পক্ষে খুব বেশি পরিমাণে বিদ্যুৎ এতক্ষণ চলাচল করছিল।'

পরবর্তী সময়ে নাদিয়েঝদা তাঁর স্মৃতিকথায় আখমাতভা সম্পর্কে মান্দেলস্তামের আরও একটি মন্তব্য উল্লেখ করেছেন, আখমাতভাকে বানানোই হয়েছে 'গভীর সখ্যের জন্যে, কোনো প্রেমের বন্ধনে পড়ার জন্য নয়।' এর পরপরই নাদিয়েঝদা যোগ করতে ভোলেননি, 'আন্নার জীবনে অনেকবারই প্রেম এসেছে, কিন্তু প্রতিটি প্রেমের ক্ষেত্রেই প্রাথমিক কোনো সংকট দেখা দিতেই তা তাসের ঘরের মতো ভেঙে গেছে। কিন্তু ওসিপের সঙ্গে আন্নার গভীর ব্যক্তিগত ও আন্তরিক সম্পর্কে কখনোই চিড় ধরেনি।'

মান্দেলস্তামের বাসায় আন্নাকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের সবারই নজরে পড়েছে তাঁর নির্বিকার দারিদ্র্য। একই স্যুটকেস নিয়ে আন্না কুড়ি বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। কোনো তালা নেই তাতে—দড়ি দিয়ে বেঁধে না রাখলে খুলে যায়। পোশাক বলতে একটা পুরোনো টুপি—বিপ্লবপূর্ব আমলের, আরেকটা হালকা কোট—সারা বছর ধরে এ-ই ছিল তাঁর বাইরের বেশভূষা। ঘরের ভেতরে তিনি পড়তেন লালচে পাজামা, আর ওপরে জড়ানো থাকত তাঁর বহু-বিখ্যাত পশমিনা শাল; যদিও সেটিরও কিছুটা ঝলসে যাওয়া অবস্থা, অনেকটা আন্নার গায়ের রঙের মতো, সময়ের হাওয়ায় ঢেউয়ে বালুকণায় বিবর্ণ হয়ে এসেছে। কে বলবে, এই সেই আন্না, যাকে নিয়ে মদিলিয়ানি পোর্ট্রেট এঁকেছেন! সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের সঙ্গে তাঁর মানসিক বা বৈষয়িক কোনো যোগাযোগ নেই। আখমাতভা রাইটার্স ইউনিয়নের বাইরে। সদস্যপদ নেই তাঁর, সদস্যপদ চাওয়ার কথা এখনো মনে হয়নি তাঁর। আর দেশদ্রোহী গুমিলিয়ভের স্ত্রীকে কোন ইউনিয়নই বা সদস্যপদ দেবে? তা ছাড়া তাঁর কবিতা তো কেবল আত্মনিমগ্ন পাঠকের জন্য। প্রলেতকাল্টের কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্লোগান নেই এতে। এই রাষ্ট্র যে তার জন্য কোনো বয়স্ক ভাতা, মাসোহারা বা পেনশনের ব্যবস্থা করেনি, সেটি আন্না খুব স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছেন। আর্থিক চাপে পড়ে পুত্র লেভকে আন্না বাধ্য হয়ে রেখেছেন মান্দেলস্তামের কাছে। এবার ওসিপের বাসায় আসার সময় তিনি সঙ্গে করে এনেছেন তাঁর ওপরে করা একটি ছোট স্টাচু, যেটি বহুকাল আগে ভাস্কর এলেনা ডানকো তৈরি করেছিলেন। উদ্দেশ্য—মস্কোর কালোবাজারে বিক্রি করে যদি কিছু অর্থ মেলে, তাহলে তা মান্দেলস্তামকে দিয়ে যাবেন।

১৯৩৪ সালের ১৩ মে আন্না বরাবরের মতো শুয়ে আছেন মান্দেলস্তামের ছোট্ট গেস্টরুমটিতে। এখানে এলে রান্নাঘরের পাশের এই রুমেই তাঁর শোয়ার ব্যবস্থা হয়। এতে সুবিধাই হয়েছে। আন্না অনেক রাত অবধি জেগে কাজ করেন। রান্নাঘরে গিয়ে চায়ের জল বসিয়ে জানালা খুলে সিগারেট খেতে পারেন। রাতের নির্জনে মাথায় কবিতার লাইন আনাগোনা করে। সে রাতেও সেভাবেই জেগে ছিলেন তিনি। রাত তখন প্রায় একটা। এমন সময় দরজায় কড়া নড়ে উঠল জোরে। কিছুক্ষণ আগেই আন্না এসেছেন বলে মান্দেলস্তাম প্রতিবেশী কারও বাসায় সেদ্ধ ডিম চাইতে গেছেন। লেভও বাসায় নেই। সে মাকে জায়গা করে দেওয়ার জন্য নিচের এক প্রতিবেশীর বাসায় রাতের বেলা ঘুমাতে যায়। প্রতিবেশী না বলে তাঁকে প্রতিবেশিনী বলাই ভালো। কেননা লেভের সঙ্গে ইতিমধ্যে প্রতিবেশিনী নিনা ওলশেভস্কায়ার বেশ অসমবয়সী সখ্য গড়ে উঠেছে। নিনা বাস্তবিকই অসম্ভব সুন্দরী। তখনকার দিনের সেরা নাট্যালয় মস্কো আর্ট থিয়েটারে অভিনয় করে। এই থিয়েটারের জন্মলগ্ন থেকে চেখভ জড়িত ছিলেন। নিনার আরেক পরিচয়—সে স্তানিস্লাভস্কির 'অভিনয় পাঠশালা'র প্রথম ব্যাচের ছাত্রী। সে তার শোবার ঘরের দেয়ালে প্রিয় কবি-সাহিত্যিকদের ছবি টাঙিয়ে রেখেছে। তার দাবি, এঁরা সবাই নাকি কোনো-না-কোনো সময় তার প্রেমে পড়েছিল! নিনার সঙ্গে লেভেরও যে লক্ষণীয় ঘনিষ্ঠতা হচ্ছে, সেটা আন্নাও বেশ বুঝতে পারছিলেন। এ নিয়ে তিনি কিছুটা উদ্বিগ্ন। লেভের তরুণ বয়স, তা ছাড়া সে সবাইকে মনভোলানো কথা বলতে পারে। নিনার মতো সব সময় 'স্খলিত বসনে থাকা অভিনেত্রীর' প্রতি তার দৈহিক আকর্ষণ জন্মানো অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু মা হয়ে তিনি এ ব্যবস্থা মেনে নিতে পারছেন না স্বাভাবিকভাবেই।

রাতের কড়ানাড়ায় প্রথমে দরজা খুলে দিলেন আন্নাই। সোভিয়েত গোয়েন্দা পুলিশের কয়েকজন সদস্য দলেবলে ঘরে ঢুকে সবার পরিচয়পত্র দেখতে চাইল। যেসব পুলিশি সংস্থার পরিচিতি হয় সংক্ষেপে, শুধু অর্থহীন বর্ণমালার ধ্বনিঝংকারে, সেসব আবার সবচেয়ে বেশি ভয়ংকর হয়। আর এসব সংস্থা প্রতিটি দেশে ও কালে সংক্ষেপিত নামেই কুখ্যাত ও আতঙ্কজনক হয়ে ওঠে। আমেরিকায় যেমন সিআইএ, রাশিয়ায় তেমনি কেজিবি। আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য পুরো নামটা জানাটা দরকার নেই, সংক্ষিপ্ত পরিচয়ই যথেষ্ট। তবে আমরা যে সময়ের কথা বলছি, তখন এর নাম ছিল এনকেভেদে—এর আবার পূর্ববর্তী নাম ছিল ওজিপিইউ, তারও আগে চেকা।

আন্না অবশ্য এতসব খবর রাখেন না। ঘরে ঢুকে সিক্রেট পুলিশের সদস্যরা মান্দেলস্তামকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা দেখাল, তাতে সই ছিল গেনরিখ ইয়াগোদার। ইয়াগোদা যে সিক্রেট পুলিশের প্রধান এটি সবারই জানা। হঠাৎ করেই আখমাতভার মনে হলো, এবারে মান্দেলস্তামের উচিত হবে কিছু খেয়ে নেওয়া। সেদ্ধ ডিম—যেটা একটু আগে তাঁরই জন্য আনা হয়েছিল—বাড়িয়ে দিলেন ওসিপের দিকে। মান্দেলস্তাম বসে বসে বেশ কিছুটা সময় নিয়ে ডিমটা একটু লবণ দিয়ে খেলেন। সারা রাত ধরে ফ্ল্যাট ওলটপালট করে এনকেভেদের সদস্যদের খোঁজাখুঁজি চলল—যেন পুরো ফ্ল্যাটটাই একটা গোপন মাইনফিল্ড। সতর্কতার সঙ্গে মাইন খুঁজে খুঁজে বের করতে হচ্ছে। ভোরের দিকে ফিরে যাওয়ার সময় ওরা সঙ্গে নিয়ে গেল মান্দেলস্তামকে।

পরের দিন আবারও এল ওরা—আরও কিছু পাণ্ডুলিপি সঙ্গে নিয়ে গেল। আখমাতভা ও নাদিয়েঝদা বুঝতে পারছিলেন, ওরা আসলে খুঁজছে মান্দেলস্তামের 'নেকড়ে' কবিতাটি, যেখানে স্তালিনকে নিয়ে তির্যক মন্তব্য করা হয়েছে। কুলাকবিরোধী অভিযানের সময় সাধারণ কৃষকদের ওপরও দমন-পীড়ন যেভাবে নেমে এসেছিল, তার প্রতিবাদ করাটাই ছিল এই কবিতার প্রচ্ছন্ন প্রেরণা। ওসিপের ছোটখাটো গড়ন, দৈহিক শক্তির বিচারে মোটামুটি দুর্বলই বলা যায় তাঁকে। এ রকম একটা মানুষ কী করে এতটা সাহস দেখিয়ে—বলতে গেলে, প্রায় মাথা খারাপের মতো সাহস দেখিয়ে—স্তালিনের পরোক্ষ কিন্তু স্পষ্ট ইঙ্গিতবাহী সমালোচনা করে কবিতা লিখতে পারেন এবং তা আবার বন্ধুমহলে পড়ে শোনাতে পারেন, সেটা এক হিসেবে অবিশ্বাস্য ঘটনাই। কেননা ওসিপও জানতেন, ১৯৩০-এর দশকে এটা করতে যাওয়ার অর্থ দীর্ঘ কারাভোগ অথবা কারাবাসের মধ্য দিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুকে ডেকে আনা। তাহলে কি ওসিপ মনে মনে প্রস্তুতই হয়ে ছিলেন সে রকম কোনো পরিণতির জন্য? নইলে ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কেনই বা বলবেন আখমাতভাকে, 'আমি মৃত্যুর জন্য এখন থেকেই তৈরি।'

সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন আখমাতভা। নাদিয়েঝদার পাশে এই দুঃসময়ে কিছু সময় কাটানোর পর বেরুলেন বরিস পাস্তেরনাকের খোঁজে। পাস্তেরনাক পার্টির প্রভাবশালীদের ব্যক্তিগতভাবে চেনেন। যদি তিনি এই বিপদে কিছু করতে পারেন সেই আশায়। এই গ্রেপ্তারের কথা শুনে পাস্তেরনাক গেলেন নিকোলাই বুখারিনের কাছে। বুখারিন তখন *ইজভেস্তিয়া* পত্রিকার সম্পাদক। আখমাতভাও নিজে গেলেন ক্রেমলিনে, তাঁর পূর্বপরিচিত এক পার্টি নেতা আভেল ইয়েনুকিদজের কাছে। ইয়েনুকিদজে জর্জিয়ার লোক, বিপ্লবপূর্ব সময় থেকে স্তালিনের পুরোনো কমরেড। কোন আরজিতে কাজ হলো, তা বলা শক্ত। স্তালিন পাস্তেরনাককে অপ্রত্যাশিতভাবে সরাসরি ফোন করলেন। জানতে চাইলেন, মান্দেলস্তামের কাব্যপ্রতিভা সম্পর্কে পাস্তেরনাক কী মনে করেন? পাস্তেরনাক কিছুটা সময় নিচ্ছিলেন উত্তর দিতে। এ অবস্থায় কোন উত্তরটা ওসিপের পক্ষে যাবে, তা নিয়ে শঙ্কা ছিল তাঁর মধ্যে। স্তালিন বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, পাস্তেরনাকেরই 'ভালো করে জানা উচিত বন্ধুর পক্ষে তাঁকে কীভাবে দাঁড়াতে হবে।' উত্তরে পাস্তেরনাক বলার চেষ্টা করলেন, তিনি স্তালিনকে অন্য একটা জরুরি বিষয়ে কথা বলতে চান। কেননা এর সঙ্গে একজনের জীবনমৃত্যুর প্রশ্ন জড়িত। ফোনটা তখন কেটে দিয়েছিলেন স্তালিন। এর পরপর বারকয়েক চেষ্টা করলেন যোগাযোগের, কিন্তু কোনোভাবেই পাওয়া গেল না স্তালিনকে। স্পষ্টতই আর এ নিয়ে পাস্তেরনাকের সঙ্গে কথা বলতে চাননি তিনি।

সেই ফোনকল নিয়ে কালক্রমে ছোটখাটো একটা সাহিত্য গড়ে উঠেছে। বরিস পাস্তেরনাককে বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন 'মেঘে মেঘে ঘুরে বেড়ানো

কুখ্যাত গুলাগ কারাগার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ' মনে করতেন স্তালিন। মান্দেলস্তামের মুক্তির বিষয়ে তদবির করতে গিয়ে তিনি যে কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে পাস্তেরনাক এরপর বহু বছর ধরে বলার চেষ্টা করেছেন যে স্তালিনের প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিশ্চুপ ছিলেন না একেবারে। বন্ধুর কবিপ্রতিভার মূল্যায়ন করে তিনি অন্তত এটুকু বলেছিলেন—মান্দেলস্তাম কবিদের মধ্যে অনেক 'উঁচু মাপের এক ওস্তাদ'। অর্থাৎ, তিনি রাষ্ট্রের বিশেষ বিবেচনা পাওয়ার দাবি রাখেন।

বিপজ্জনক যে কবিতাটি এনকেভেদের লোকেরা খুঁজছিল, সেটা আসলে খুঁজে পাওয়ার কথা ছিল না, কেননা কবিতাটির কোনো পাণ্ডুলিপি ছিল না। কবিতাটি ছিল কেবল কবির মাথায়। গ্রেপ্তারের পর অত্যাচারের মুখে আরও অনেকের মতো মান্দেলস্তামও ভেঙে পড়েছিলেন। একপর্যায়ে নাদিয়েঝদা মস্কোর লুবিয়ানকা জেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পান। লুবিয়ানকা রুশ ইতিহাসে এক কুখ্যাত জেলখানা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। জার আমলে এখানে বন্দী ছিলেন অনেক বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী। সোভিয়েত আমলে এর মধ্যে থেকেছেন অনেক ভিন্নমতাবলম্বী। ১৯৩০-এর দশকের শুদ্ধি অভিযানে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া অনেক পার্টি নেতাই পরবর্তীকালে এখানে আটক ছিলেন।

নাদিয়েঝদার সঙ্গে সাক্ষাতে ওসিপ জানালেন, তাঁকে যারা জিজ্ঞাসাবাদ করছেন, তাঁদের কাছে এখন ওই বিপজ্জনক কবিতাটি রয়েছে। তিনি নিজেই স্বেচ্ছায় কবিতাটি লিখে দিয়েছেন স্মৃতিশক্তি থেকে। এবং লিখে দেওয়ার সময় তিনি কবিতাটির প্রথম খসড়াটিই লিখে দিয়েছেন, যার চতুর্থ লাইনে ছিল ওই কথাটা—'কিষান হত্যার খুনিদল'। এই লাইনটা কবিতাটির অন্য খসড়াগুলোয় ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর কেজিবির অনেক গোপন আর্কাইভ খুলে দেওয়া হয়েছে। এর ভিত্তিতে ভিতালি শেনতালিনস্কির লেখা *কেজিবির লিটারেরি আর্কাইভ* বইয়ে মান্দেলস্তামের কেইস নম্বর ছিল '৪,১০৮'। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদকারীদের প্রশ্নের জবাবে মান্দেলস্তাম বলেছেন, 'হ্যাঁ, আমিই এই কবিতাটি লিখেছি। আমি এর কোনো কপি রাখিনি বা এর কোনো কপি কোথাও বিলি করিনি। আমি এটা পড়েছি খুবই ছোট্ট মহলে—যার মধ্যে আছে আমার স্ত্রী, আমার ভাই, লেখিকা আন্না আখমাতভা ও তার ছেলে লেভ গুমিলিয়ভ'। পরে অত্যাচারের মুখে, এ তালিকায় যুক্ত হয় পাস্তেরনাক ও এমা গেরস্টেইনের নাম। *মস্কো মেমোয়ার্স* বইয়ে এমা মনে করেছেন, অন্তত ১৫ জন এই কবিতাটি শুনেছেন। তাঁদের মধ্যে লেভের কোনো তরুণ বন্ধু হয়তো পুলিশের দপ্তরে এ বিষয়ে সংবাদ দিয়ে থাকবে।

যতটা ভাবা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক কম শাস্তি হয় মান্দেলস্তামের, অন্তত এবার। উরালের একটি ছোট্ট শহর শেরডিনে তিন বছরের জন্য নির্বাসনে

বরিস পাস্তেরনাক

পাঠানো হয় তাঁকে। 'বিচ্ছিন্ন করে দাও, কিন্তু টিকিয়ে রাখো'—এই নীতির ভিত্তিতে নির্বাসন হয় কবির। নাদিয়েঝদাকেও অনুমতি দেওয়া হয় তাঁর সঙ্গে নির্বাসনে থাকার জন্য। লুবিয়ানকার পর মান্দেলস্তাম মানসিকভাবে বেশ কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর কেবলই মনে হতে থাকে, আপাতত জেল থেকে মুক্তি পেলেও অচিরেই তাঁকে গুলি করে মেরে ফেলা হবে। তিনি স্বপ্নে দেখতে পান, আখমাতভাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাঁরও জিজ্ঞাসাবাদ চলছে লুবিয়ানকায়। এ রকম ভ্রমে-বিভ্রান্তে থাকা অবস্থায় শেরডিনের একটা হাসপাতালের জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে নিজের একটা হাতও ভেঙে ফেলেন মান্দেলস্তাম। খবরটা পৌঁছায় বুখারিনের কাছে। বুখারিনের হস্তক্ষেপে মান্দেলস্তামের নির্বাসনের মেয়াদ অবশ্য কমেনি, তবে নির্বাসনের জায়গা বদল হয়। রাশিয়ার ১২টি প্রধান শহর ছাড়া অন্য যেকোনো শহরে থাকার অনুমতি পান তিনি। শেষ পর্যন্ত ভারোনেঝ শহরকেই বেছে নেন তাঁরা। ১৯৩৮ সালে দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাসনে যাওয়া পর্যন্ত ভারোনেঝেই ছিল মান্দেলস্তাম দম্পতি।

আখমাতভার 'শোকগাথা' : ১৯৩৮-১৯৪৬

মান্দেলস্তামের দুঃস্বপ্ন মিথ্যা ছিল না। ১৯৩৪ সালে আখমাতভা গ্রেপ্তার হলেন না ঠিকই, কিন্তু তাঁর পরিবারের অন্যরা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হলেন অচিরেই। তত দিনে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আরও ঘোলাটে হয়ে এসেছে। মান্দেলস্তামের গ্রেপ্তারের কয়েক মাস পরই লেনিনগ্রাদ পার্টির সেক্রেটারি এবং স্তালিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও প্রধান সহযোদ্ধা সের্গেই কিরভ তাঁর নিজের শহরে আততায়ীর গুলিতে মারা গেলেন। যেদিন তাঁর মৃত্যু হলো তার দুদিন আগেই—১৯৩৪ সালের ২৯ নভেম্বর—মস্কোয় স্তালিন ও পরবর্তীকালে *মাস্টার ও মার্গারিটা*-খ্যাত সাহিত্যিক মিখাইল বুলগাকভের স্ত্রী এলেনা বুলগাকভা স্তালিনের সঙ্গে নাটক দেখতে গেছেন কিরভ। শুধু মস্কো আর্ট থিয়েটার নন, সুযোগ পেলেই কিরভ কনসার্ট শুনতে যান। নিজেও মাঝেমধ্যে অপেরার গায়কের মতো উচ্চাঙ্গ মেজাজের গান করতে ভালোবাসেন। পার্টির মধ্যে কিরভের প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা। বস্তুত ১৭তম কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের মধ্যে স্তালিনের চেয়েও বেশি ভোট পেয়েছিলেন তিনি। সাধারণভাবে মনে করা হতো যে স্তালিনের পরে কিরভই পার্টির মূল নেতা হতে যাচ্ছেন। পরবর্তীকালে—স্তালিনের মৃত্যুর পর—স্তালিনের পলিটব্যুরোর দুই সদস্য নিকিতা ক্রুশ্চেভ ও মিকোইয়ান অবশ্য এ রকম ইঙ্গিত করার প্রয়াস পেয়েছেন যে স্তালিন স্বয়ং এই হত্যার পেছনে জড়িত ছিলেন। কিন্তু কিরভ-হত্যায় সোভিয়েত রাষ্ট্রযন্ত্রের বা স্তালিনের হাত ছিল কি না, এ প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা আজও হয়নি। গত দুই দশকে অনেক আর্কাইভ তন্নতন্ন করে খোঁজার পরও এই যুক্তির পক্ষে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলেনি। তবে কিরভ-হত্যা স্তালিনকে শুদ্ধি অভিযান চালানোর পক্ষে প্রধান যুক্তি জুগিয়েছিল এ নিয়ে সন্দেহ নেই। আরেকটি পার্শ্বযুক্তিও ছিল, তা হলো জার্মানিতে ১৯৩৩ সালে হিটলারের ক্ষমতায় আরোহণ। পৃথিবীতে নাৎসিবাদের একচ্ছত্র প্রভুত্ব বিস্তারের অভিলাষের কথা সোভিয়েত পার্টির অজানা ছিল না। সব মিলিয়ে স্তালিন সর্বত্র ষড়যন্ত্র ও নাশকতামূলক পরিকল্পনা দেখছিলেন। কিন্তু কারণ যা-ই হোক, পরবর্তী ঘটনাবলির নির্মমতা ছিল এমনকি কট্টর স্তালিনবাদীদেরও কল্পনার বাইরে।

কিরভ-হত্যার এক মাসের মধ্যে—শুধু ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসেই—৬৫০১ জন লোক এ হত্যার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত থাকার কোনো-না-কোনো অভিযোগে গ্রেপ্তার হন ও গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি এ রকম একজন বন্দী 'স্বীকার করলেন' যে এই হত্যার সঙ্গে জড়িত আছেন এমনকি জিনোভিয়েভ ও কামেনেভের মতো পুরোনো বলশেভিকরা পর্যন্ত। কামেনেভ প্রথমে স্বীকার করতে চাননি এই অভিযোগ—পরপর কয়েক দিন নিদ্রাহীন রেখে শাস্তি দেওয়ার চিরাচরিত পদ্ধতির পরও। পরে সিক্রেট পুলিশের প্রধান ইয়েজভ নিজে জেলখানায় এসে হুমকি দিলেন যে অভিযোগ স্বীকার না করলে কামেনেভের ছেলেকেও গুলি করে মারা হবে। জিনোভিয়েভ ও কামেনেভকে যথাক্রমে দশ ও পাঁচ বছরের জেল দেওয়া হলো। পরে অবশ্য সে শাস্তির ধরন বদলাবে এবং ১৯৩৬ সালের ২৫ আগস্ট দুজনকেই গুলি করে মারা হবে। বস্তুত কামেনেভ ও জিনোভিয়েভসহ আরও ১৬ জন পুরোনো আমলের বলশেভিককে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম মস্কো শো-ট্রায়াল। কথিত আছে, কামেনেভের বন্ধু অসুস্থ গোর্কির কাছে দৈনিক পত্রিকা *প্রাভদার* একটি নকল সংখ্যা পর্যন্ত ছাপিয়ে দেখানো হয় যে তিনি সত্যিই সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন এবং এ মর্মে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। কিরভ-হত্যার প্রবল প্রতিক্রিয়ার বানে এভাবে রাশিয়ার সব জেলখানা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওসিপ মান্দেলস্তাম

নাদিয়েঝদা মান্দেলস্তাম

নির্বাসন-শিবির (গুলাগ) বন্দীতে বন্দীতে উপচে পড়ল। এ সময় স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ নাগরিকেরা সবাই নিজের ও তাদের পরিবারের জন্য আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন।

১৯৩৫ সালের গ্রীষ্মে আখমাতভা দেখা করলেন পাস্তেরনাকের সঙ্গে। পাস্তেরনাক সে সময় সদ্য ফিরে এসেছেন প্যারিসের ইন্টারন্যাশনাল রাইটার্স কংগ্রেস থেকে। পাস্তেরনাককে মায়াকোভ্স্কির মৃত্যুর পরে 'রুশ কবিতার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি' মনে করেন স্তালিন। গোর্কি তখনো জীবিত, তবে গুরুতর অসুস্থ। তাঁর বিদেশে-ভ্রমণের মতো অবস্থা নেই। গোর্কির অবর্তমানে পাস্তেরনাকই সোভিয়েত দলের প্রধান। তবে এরই মধ্যে পাস্তেরনাকের মধ্যে কিছুটা মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। আন্নাকে খুলেই বললেন সে কথা। দুজন প্রধান কবিই পরস্পরকে বহু বছর ধরে ঘনিষ্ঠভাবে জানেন। পরস্পরকে দুজনেই জানালেন যে আগের মতো আর লেখা আসছে না তাঁদের কলমে। প্রতিদিনই যিনি কবিতা লেখেন, সেই পাস্তেরনাকের মাথায় কবিতার কোনো পঙ্ক্তি নেই। আখমাতভা আরও বিষণ্ন। তিনি এমনকি বললেন, আর কখনো তাঁর পক্ষে কোনো কবিতা লেখা সম্ভব হবে কি না কে জানে! বরিসের কাছে আন্না জানতে চাইলেন মারিনা সিভেতায়েভার কথা। মারিনা তাঁর স্বামী ও সন্তানসহ সে সময় থাকতেন প্যারিসে। ১৯২১ সালের পর তিনি আর রাশিয়ায় ফিরে যাননি।

তবে নিছক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য পাস্তেরনাকের কাছে যাননি আখমাতভা। এখন তাঁর যত দুর্ভাবনা তাঁর ছেলে লেভ গুমিলিয়ভকে নিয়ে। মান্দেলস্তামের সময়ে পাস্তেরনাক সাহায্য করেছিলেন সে কথা আন্নার মনে আছে। তাঁর ছেলের যদি বিপদ হয়, তাহলে পাস্তেরনাকের সাহায্য আবারও চাইতে হবে তাঁকে। গুমিলিয়ভের মৃত্যুর পর আখমাতভা একাধিক বিয়ে করেছিলেন। দ্বিতীয় বিয়েটা দুবছরের বেশি টেকেনি। তৃতীয় বিয়ে যাঁর সঙ্গে তাঁর নাম নিকোলাই পুনিন—তাঁর বহুদিনের বন্ধু। নানা চড়াই-উতরাইয়ের পর এটি এখনো টিকে আছে। আন্নার দুশ্চিন্তা হয় পুনিনকে নিয়েও। পুনিন অনেক সময় স্থানকালপাত্র ভুলে গিয়ে অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য করে ফেলতে পারেন। সম্প্রতি এক ঘরোয়া বৈঠকে তিনি একটি ক্যামেরা দেখিয়ে বলেছেন, এটা দিয়ে স্তালিনকেও মারা যেতে পারে। আসলে তিনি যেটা বলতে চেয়েছেন, সেটা হলো ক্যামেরাটা এতই ঘর্ঘর শব্দ করে যে এর শব্দে আততায়ীর গুলির শব্দও চাপা পড়ে যাবে। তার পরও ও রকম একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করা—তাও এমন সময়ে—পুনিনের কোনোমতেই উচিত হয়নি। এমনিতে পুনিন ধীরস্থির মানুষ; শিল্প-সমালোচক ও শিল্পকলার ঐতিহাসিক হিসেবে খ্যাতিমান। চিত্রকর্মের ইতিহাস নিয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন, এখন নিজেই অধ্যাপক এই বিষয়ে। স্টেট রাশিয়ান মিউজিয়ামে আইকনোগ্রাফি নামে একটি নতুন বিভাগ চালু করেছেন। আর্টবিষয়ক একটি নামকরা পত্রিকার সম্পাদকও তিনি। স্বয়ং লুনাচারস্কি (একসময়ে শিক্ষামন্ত্রী) তাঁকে হের্মিতেজ মিউজিয়ামে কিউরেটরের চাকরির ব্যবস্থা করেছিলেন। কাজিমির

ভাইয়ের সঙ্গে আন্না, ১৯০৫

মালেভিচ, ভ্লাদিমির তাতলিন প্রমুখ শিল্পীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ছিল। অনেকে তাঁকে দেখতেন 'বামপন্থী শিল্পকলা'র তাত্ত্বিক হিসেবে। তবে ছিলেন তিনি লুনাচারস্কির মতোই সহজিয়া বামপন্থী। এখন জানা যাচ্ছে, পুনিনের চেষ্টার ফলেই সোভিয়েত আমলে হের্মিতেজ ও স্টেট রাশান মিউজিয়ামে বিপ্লবপূর্বকালে আহরিত পাশ্চাত্যের অনেক চিত্রকলাকে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়। এদিকে, আন্নার প্রথম পক্ষের স্বামী প্রয়াত নিকোলাই গুমিলিয়ভের ছেলে লেভ লেনিনগ্রাদে পড়ছে এথনোগ্রাফি নিয়ে। কিছুটা অস্থিরপনা সত্ত্বেও তাঁর ফলাফল ক্লাসে সবার শীর্ষে। তাঁর মাথায় বুদ্‌বুদের মতো সারাক্ষণ নতুন নতুন আইডিয়া টগবগ করতে থাকে।

আখমাতভা যে পরিণতি এড়াতে চেয়েছিলেন, তা শেষটায় ঘটেই গেল। ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে লেভ ও পুনিন উভয়েই সোভিয়েত-বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন। মস্কোর লুবিয়ানকা জেলের মতো লেনিনগ্রাদের লিটেইনি প্রসপেক্টে একটি নতুন জেলখানা নির্মাণ করা হয়েছে। সেখানেই জড়ো করা হলো তাঁদের। পুনিনের সঙ্গে তত দিন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলেও আনুষ্ঠানিকভাবে ডিভোর্স হয়নি আন্নার। আখমাতভা ঘরের মধ্যে যা কিছু কাগজপত্র-দলিল দস্তাবেজ ছিল সব পুড়িয়ে ফেলতে লাগলেন, যাতে করে পুনিনকে বাড়তি কোনো সমস্যায় ফেলতে পারে এমন কিছু তাদের বাসায় খুঁজে না পায় গোয়েন্দা পুলিশ। পুনিনের সঙ্গে বনিবনা নেই এটা সত্য, কিন্তু এ কথা আন্না কী করে অস্বীকার করবেন যে তাঁরা দুজনই একই স্কুলে পড়ালেখা করেছেন, অর্থাৎ বাল্যকালের সাথি। এঁদের কী করে ছাড়িয়ে আনা যায়, সে জন্য কার কাছে ধরনা দেবেন—তা-ই ঠিক করতে পারলেন না আন্না। শুধু পাস্তেরনাক বললেন, তিনি তাঁর ধারায় চেষ্টা করে দেখবেন কী করা যায়। শেষ পর্যন্ত লিদিয়া সাইফুলিনা বলে এক লেখিকার পরামর্শে আন্না ঠিক করলেন যে সরাসরি আবেদন জানিয়ে চিঠি লিখবেন স্তালিনকে। কথিত আছে, লিদিয়ার আসা-যাওয়া ছিল রাষ্ট্রের বেশ উঁচু মহলে; এমনকি এনকেভেদের কর্মকর্তাদের কারও কারও সঙ্গেও তাঁর উঠাবসা ছিল। আন্না অবশ্য এ বিষয়ে লিদিয়াকে কখনোই সন্দেহ করেননি।

লিদিয়ার পরামর্শ মেনে স্তালিনকে একটি চিঠি লিখে সেটা খামে ভরে তিনি রওনা হলেন ক্রেমলিনের দিকে। উদ্দেশ্য, স্তালিনের সেক্রেটারি পসক্রেবিশেভের হাতে নিজেই খামটা তুলে দেওয়া। চিঠিটা শেষ পর্যন্ত স্তালিনের কাছে পৌঁছেছিল। নিজের ছেলে ও স্বামীকে ছাড়ানোর আবেদন জানানোর চিঠি হলেও তাতে মানসিকভাবে 'নুয়ে পড়ার' ব্যাপার ছিল না। যে ছবিটা তাতে ভেসে উঠেছিল সেটি হচ্ছে স্বীয় প্রতিভা সম্পর্কে দ্বিধাহীন, আপন মতে অবিচল এক দৃঢ় মনের নারীর। রুশি রীতি অনুযায়ী, স্তালিনের প্রথম নাম (ইওসেফ, ইংরেজিতে জোসেফ) ও মাঝখানের নাম (যা পিতার নাম থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্না আখমাতভা

নিকোলাই গুমিলিয়ভ

প্রাপ্ত) মিলিয়ে যথাবিহিত সম্ভাষণপূর্বক শুরু হয়েছে চিঠিটি। ভাষাটা মোটামুটি এ রকম :

শ্রদ্ধেয় ইয়োসেফ ভিসারিওনোভিচ,

আমাদের সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রতি, বিশেষত লেখকদের প্রতি, আপনার মনোযোগী দৃষ্টিভঙ্গির কথা জেনেই আমি সরাসরি এই চিঠি লিখতে সাহসী হয়েছি। গত ২৩ অক্টোবর লেনিনগ্রাদে নিকোলাই পুনিন (শিল্পকলার অধ্যাপক) ও আমার পুত্র লেভকে এনকেভেদে গ্রেপ্তার করেছে। আমি জানি না, তাদের সম্পর্কে কী অভিযোগ আনা হয়েছে। তবে আমি এটুকু কথা দিতে পারি যে, তারা ফ্যাসিবাদের সমর্থক নয়, নয় কোনো গুপ্তচর, কিংবা কোনো প্রতিবিপ্লবী গ্রুপের সদস্য। আমি বিপ্লবের পর থেকে একাধারে সোভিয়েত ইউনিয়নে বাস করে আসছি। আমি কখনো এই দেশ ছেড়ে যেতে চাইনি। এ দেশের সঙ্গে আমি হৃদয়ে ও মনে যুক্ত হয়ে আছি—এটা জানার পরও যে এ দেশে এখন আমার আর কোনো কবিতা প্রকাশিত হয় না এবং সমালোচকদের তিক্ত অনেক আলোচনা এখনো আমাকে সইতে হয়। তার পরও আমি নিজেকে কখনো হতাশার দিকে ঠেলে দিইনি। মানসিক ও বৈষয়িকভাবে ক্লেশকর জীবন যাপন করছি এবং এর মধ্যেই কাজ করে চলেছি। সম্প্রতি পুশকিনের ওপর একটি গবেষণাপত্র শেষ করেছি। দ্বিতীয় গবেষণাপত্রটিও যন্ত্রস্থ রয়েছে। লেনিনগ্রাদে নিঃসঙ্গতার মধ্যে আমার দিন কাটে; অনেক সময় দীর্ঘদিন ধরে আমাকে অসুস্থ থাকতে হয়। যে দুজন ব্যক্তি আমার জীবনে সবচেয়ে নিকটের তাদের গ্রেপ্তার আমাকে প্রবলভাবে ধাক্কা দিয়েছে। আমি এ আঘাত সামলে উঠে দাঁড়াতে পারব না।

সে জন্য, ইয়োসেফ ভিসারিওনোভিচ, আপনাকে আমি অনুরোধ করছি, আপনি আমার স্বামী ও ছেলেকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিন। আমি নিশ্চিত যে এটা করলে আপনাকে কখনোই এই সিদ্ধান্তটি নিয়ে ভবিষ্যতে মনঃকষ্ট পেতে হবে না।

১৯৩৫ সালের ১ নভেম্বরের তারিখ দিয়ে আন্নার স্বাক্ষর রয়েছে চিঠিটার সবশেষে। পরিকল্পনামতো বা কাকতালীয়ভাবে পাস্তেরনাকও ওই একই দিনে—এবং এবার অনেক সাহস দেখিয়ে—আখমাতভার পক্ষে একটি চিঠি লিখলেন স্তালিনের কাছে :

একবার আমাকে আপনি তিরস্কার করেছিলেন এই বলে যে আমি কেন আমার কমরেডদের প্রতি নির্বিকার থাকি। তাঁদের ও আমাদের সংস্কৃতির জন্য আখমাতভার জীবন খুবই মূল্যবান। তা ছাড়া আমি দেখেছি কী সততার সঙ্গে, কতটা কষ্টের মধ্যে এবং কোনো অভিযোগ তোলা ছাড়াই তাঁকে জীবন নির্বাহ করতে। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি আখমাতভাকে সাহায্য করতে, তাঁর স্বামী ও পুত্রকে মুক্ত করার উদ্যোগ নিতে। তাঁদের সততা যাচাই করার ক্ষেত্রে আখমাতভার দৃষ্টিভঙ্গিই আমার জন্য যথেষ্ট প্রামাণ্য দলিল।

AMARBOI.COM

পাস্তেরনাক এ রকম কাজ আর কারও জন্যই করেননি জীবনে। কিন্তু আন্নার জন্য এই ঝুঁকি তাঁকে নিতেই হয়েছিল। সেটা আন্নাও বোঝেন। চিঠিটা যেদিন পাঠালেন, সেদিন বেশ কিছুটা সময় কাটালেন পাস্তেরনাক দম্পতির সঙ্গে। রাতে সেখানেই থেকে গেলেন।

চিঠি দুটোতে কাজ হয়েছিল। আখমাতভার চিঠির ডানদিকের মার্জিনে স্তালিন গোয়েন্দা পুলিশ দপ্তরের প্রধানকে লিখলেন, 'কমরেড ইয়াগোদার জ্ঞাতার্থে : পুনিন ও গুমিলিয়ভকে আটকাবস্থা থেকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হোক এবং উত্তর দিয়ে আমাকে জানান যে আদেশটি কার্যকর হয়েছে। স্তালিন।' পরের দিনই মুক্তি পেলেন পুনিন ও লেভ। মুক্তির আদেশ যখন তাঁর কাছে মাঝরাতে আসল, পুনিন প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেননি। তারপর জেলের রক্ষকদের উল্টো অনুরোধ করলেন সকাল পর্যন্ত তাঁকে সেখানেই রেখে দিতে, কেননা অত রাতে বাড়ি ফেরার জন্য কোনো ট্রাম চলাচল করে না।

এবার আখমাতভার পরিবার গ্রেপ্তারের থেকে প্রায় অলৌকিকভাবে রক্ষা পেলেন বটে, কিন্তু এ রকম সৌভাগ্য পরবর্তী সময়ে আর হবে না তাঁর। ১৯৩৬ সালে ২৪ বছর বয়সে লেভ লেনিনগ্রাদ ইউনিভার্সিটি থেকে বহিষ্কৃত হবেন, পুনিনের সঙ্গে আন্নার ব্যক্তিগত সম্পর্ক আরও খারাপ হতে থাকবে—সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হবে আর্থিক দিক থেকে। ওই বছরই নির্বাসিত মান্দেলস্তাম দম্পতিকে দেখার জন্য প্রায় ৩৬ ঘণ্টার ট্রেনযাত্রার ধকল সহ্য করে লেনিনগ্রাদ থেকে ভারোনেঝ যাবেন আখমাতভা। ১৯৩০-এর দশকে বিপদের গন্ধ পেলে পরিবারের নিকট সদস্যরাই যেখানে সন্দেহভাজন স্বজনকে এড়িয়ে চলতেন, সেখানে আন্না কোনো তোয়াক্কা না করেই নির্বাসিত মান্দেলস্তাম দম্পতিকে দেখতে সুদূর ভারোনেঝ চলে গিয়েছিলেন। এ থেকেও মান্দেলস্তাম ও আখমাতভার মধ্যকার সম্পর্কের নৈকট্য বুঝতে পারা যায়।

মান্দেলস্তাম মারা গেলেন ১৯৩৮ সালে। আর বছর দুই বেঁচে থাকলে তিনি হয়তো শেষপর্যন্ত বেঁচে থাকতেন অনেক দিন। ১৯৩৮ সাল ছিল শুদ্ধি অভিযানের সবচেয়ে কঠিন বছর। তত দিনে গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধান হিসেবে ইয়াগোদার পরিবর্তে এসেছেন ইয়েজভ। তিনি পূর্বসূরির চেয়ে আরও নির্দয়ভাবে ছড়ি ঘুরিয়েছেন। ইয়াগোদাকেও সোভিয়েত রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের জন্য গুলি করে মারা হয়। নিজে উপস্থিত থেকে এ কাজ সুসম্পাদন নিশ্চিত করেন ইয়েজভ অথচ কিছুদিন আগে তিনি নিজেই ছিলেন ইয়াগোদার ডেপুটি। তাঁর নাম অনুসরণ করে 'আতঙ্কের শাসন'-এর এক নতুন রুশি প্রতিশব্দও উদ্ভাবিত হয়েছে ইতিমধ্যে। জনগণ এই সময়টাকে বলতে শুরু করেছে 'ইয়েজভশিনা' নামে। কে কখন কিসের জন্য চারপাশ থেকে গুম হয়ে যাবে, তার ঠিক নেই। ১৯৩৮ সালের মার্চে বুখারিনও দ্বিতীয় মস্কো শো-ট্রায়ালে অভিযুক্ত হয়ে মারা গেলেন। মান্দেলস্তাম যে মারা গেছেন, সে খবর মস্কোয় বা লেনিনগ্রাদে পৌঁছাল বেশ কিছুটা দেরিতে। ১৯৩৯ সালের শুরুতে আখমাতভার কাছে খবরটা এল। সাংকেতিকভাবে তাঁকে মস্কো থেকে এক বন্ধু চিঠিতে জানিয়েছে, 'আমাদের বন্ধু লেনার একটি শিশুসন্তান হয়েছে এবং আমাদের বন্ধু নাদিয়েঝদা বিধবা হয়েছেন।'

১৯৩৮ সালের শুরুর দিকে কালিনিনগ্রাদে চলে আসে মান্দেলস্তাম দম্পতি, এমনকি সরকার থেকে কিছু রেশন পাওয়ারও ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ওই বছরের মে মাসেই মান্দেলস্তাম গ্রেপ্তার হন। আগস্টে তাঁকে পাঁচ বছরের সাজা দিয়ে দূরপ্রাচ্যের কোনো এক হিমাঙ্কের অনেক নিচের 'ট্রানজিট-ক্যাম্পে' (সংশোধনাগারে) স্থানান্তর করা হয়। নাদিয়েঝদার সঙ্গে তাঁর আর দেখা হয়নি। ১৯৩৪ সালে যখন বুখারিনের অনুরোধে তাঁকে দয়া দেখানো হয়, স্তালিন নাকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এনকেভেদেকে বলেছিলেন, 'বিচ্ছিন্ন করে দাও, তবে জীবিত রাখো।' এর পর থেকে বেশ কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন মান্দেলস্তাম। প্রতিবারই তাঁকে, যেভাবে হোক, জীবিত রাখা হয়েছে।

শেষের দিনগুলোয় নির্বাসন ক্যাম্পে শতচ্ছিন্ন পোশাক, মাথাভর্তি উকুন, দেহে নানা ধরনের ক্ষত নিয়ে মান্দেলস্তাম বন্দীদের পড়ে শোনাতেন তাঁর কবিতা, পরিবর্তে বাড়তি কিছু রুটি খাওয়ার আশায়। কালিনিনগ্রাদে আসার সুপরামর্শ যিনি দিয়েছিলেন, তিনি হলেন গোর্কির বন্ধু ও ভাবশিষ্য লেখক ইসাক বেবেল। তিনিও সোভিয়েত-বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে ১৯৩৯ সালে গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৪০ সালের ২৭ জানুয়ারি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। নাদিয়েঝদা মান্দেলস্তামকে নিয়ে পরবর্তীকালে তিনি তাঁর দীর্ঘ স্মৃতিকথা লিখেছিলেন। কিন্তু সেটা প্রকাশিত হয় ১৯৭০-এর দশকে। তবে একজন তাঁকে নিয়ে উচ্চকণ্ঠ হয়েছিলেন স্তালিনের মৃত্যুর পরপরই। যখন প্রায় সবাই তাঁর কথা ভুলে গেছে, ঠিক সে সময়, ১৯৬০ সালে, ইলিয়া এরেনবুর্গ *নোভি মির* পত্রিকায় একটি দীর্ঘ স্মৃতিকথা লেখেন মান্দেলস্তাম সম্পর্কে। এই প্রথম তাঁর ট্র্যাজিক মৃত্যু নিয়ে জনসমক্ষে কেউ কিছু বললেন। প্রবন্ধটি ছিল এরেনবুর্গের *পিপল ইয়ার্স, লাইফ* শীর্ষক বহুপ্রতীক্ষিত স্মৃতিকথার অংশ। তাতে এরেনবুর্গ এ-ও লিখেছেন, ১৯৫০-এর দশকে ফাদায়েভ একদিন এরেনবুর্গের কাছে এসে মান্দেলস্তামের অনেকগুলো কবিতা মন থেকে হুবহু আওড়ে গিয়েছিলেন। তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে বলেছিলেন: 'বলুন, এসব কবিতা রুশ কবিতার সেরাগুলোর মধ্যে পড়ে কি না?' *দ্য ইয়াং গার্ড*-এর লেখক আলেকসান্দর ফাদায়েভ এর কয়েক মাসের মধ্যেই আত্মহত্যা করেন। এরেনবুর্গই বলেছেন সবার মনের কথাটা, 'এই কৃশকায় দেহের কবি, যাঁর কবিতার সংগীত আমাদের রাত্রিকে ভরিয়ে রাখে, সে কারও জন্য হুমকির কারণ কী করে হতে পারে?'

মান্দেলস্তামের মৃত্যুতে আখমাতভার জীবনের একটা অধ্যায় চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে গেল। রুশ কবিতার রজত-যুগের কবি ছিলেন গুমিলিয়ভ, মান্দেলস্তাম ও আখমাতভা। তিনের মধ্যে দুই গেলেন, রইলেন একজন। এর মধ্যে আখমাতভা আরও একা হয়ে এসেছেন। লেভ আবার বড় ধরনের বিপদে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ শতকের রুশ সাহিত্য পড়াতে গিয়ে এক অধ্যাপক লেভের পিতা নিকোলাই গুমিলিয়ভকে নিয়ে কিছু বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করে বসেন। প্রফেসরের বক্তব্য ছিল, 'গুমিলিয়ভ আবিসিনিয়া সম্পর্কে লিখেছিলেন, অথচ আলজেরিয়ার বাইরে, অন্য কোনো আফ্রিকার দেশেই তিনি কখনো যাননি।' সেই ক্লাসে বসা ছিলেন লেভ। লেভ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'না, না, তিনি আসলে আলজেরিয়ায় কখনোই যাননি, কিন্তু আবিসিনিয়াতে গিয়েছিলেন।' প্রফেসর বললেন, 'কে বেশি জানে? তুমি না আমি?' লেভ উত্তর দিলেন, 'বলা

আন্না আখমাতভা ও বরিস পাস্তেরনাক, ১৯৪০

বাহুল্য, আমি।' এতে প্রফেসর খেপে গিয়ে ইউনিভার্সিটির নতুন ডিনের কাছে অভিযোগ জানালেন। তিনি আবার বিষয়টাকে নিয়ে গেলেন আরও ওপরে। বিপ্লবের শত্রু, কাউন্টার-রেভোল্যুশনারি হিসেবে যাঁকে গুলি করে মারা হয়েছে, তাঁর ছেলে হয়ে এতটা ঔদ্ধত্য হতে পারে, এটাই এ ক্ষেত্রে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল লেভের জন্য।

১৯৩৮ সালের ১০ মার্চ লেভকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৩৫-এর গ্রেপ্তারের ঘটনার তুলনায় এবার তাঁর সঙ্গে অনেক বেশি দুর্ব্যবহার করা হয় জিজ্ঞাসাবাদের সময়। এই প্রথম তাঁকে দৈহিক নির্যাতন করা হয়, তাও লাগাত আট রাত ধরে। লেভের সঙ্গে আরও কিছু ছাত্র গ্রেপ্তার হয়—তারা নাকি ত্রৎস্কিপন্থী কোনো নাশকতামূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, এ রকম অভিযোগ এনে ৫০ মিনিটের মধ্যেই বিচারকার্য সমাধা করা হয় সংক্ষিপ্ত সামরিক ট্রাইব্যুনালে। লেভ পান প্রিজন ক্যাম্পে দশ বছরের সাজা। এ সাজাভোগের পরও অতিরিক্ত আরও চার বছর তাঁর কোনো নাগরিক অধিকার থাকবে না। জেলে আখমাতভা যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, লেভ বলল, ত্রৎস্কি-সমর্থক কার্ল রাদেকের সমান সাজা দেওয়া হয়েছে তাঁকে। রাদেক কমিন্টার্নের সেক্রেটারি ছিলেন এবং ১৯৩৬ সালের সোভিয়েত সংবিধানের রচনাকর্মে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আন্নার মনে পড়ল, রাদেক দুবছর কারাভোগের মধ্যেই মারা যান। কথিত আছে, জেলের মধ্যে এক কয়েদি তাঁকে আক্রমণ করে। লেভের ভাগ্যে তাহলে কী আছে কে জানে! কিন্তু এবার তাঁকে সাহায্য করার মতো পাশে কেউ নেই, এমনকি পুনিনও।

১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিকোলাই পুনিনের সঙ্গে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ হয়ে যাবে আখমাতভার। পুনিন আবারও গ্রেপ্তার হবেন, অবশ্য আরও পরে—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেরও পরে। ১৯৪৯ সালে কুখ্যাত 'লেনিনগ্রাদ অ্যাফেয়ার'-এর সূত্র ধরে নিকোলাই পুনিনকে পাঠানো হবে গুলাগে। তাঁর শেষ জীবনটা—১৯৫৩ সালে মৃত্যু পর্যন্ত—কাটবে ভলকুতায়। লেভ বহু বছর থাকবেন কখনো জেলখানায়, কখনো নির্বাসন ক্যাম্পে, কখনো লেনিনগ্রাদে, কখনো নরলিস্কে, কখনো ভলকুতার গুলাগ শিবিরে।

লেনিনগ্রাদের ক্রেস্তি প্রিজনে যে কয়টা দিন লেভকে রাখা হয়েছিল, তার দেখা পাওয়ার জন্য আন্না প্রায় প্রতিদিনই যেতেন। জেলখানার বাইরে লম্বা লাইনে আরও অনেক মায়ের মতো আখমাতভাও দাঁড়িয়ে থাকতেন। তাঁর হাতে থাকত লেভের জন্য কিছু শুকনো খাবার ও কিছু কাপড়—যদি গার্ডকে বলে-কয়ে ভেতরে পৌঁছানো যায়। এভাবে দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে পা ফুলে যেত আন্নার। আখমাতভার বিখ্যাত 'শোকগাথা' কবিতার শুরুতে 'ভূমিকার পরিবর্তে' বলে একটি অংশ রয়েছে। সেখানে আখমাতভা লিখেছেন:

> ইয়েজভ-আতঙ্কের ভয়ানক বছরগুলোয় আমি প্রায় সতেরোটা মাস লেনিনগ্রাদে জেলের বাইরে লাইনে লাইনে কাটিয়েছি। একদিন ভিড়ের মধ্যে কে যেন আমাকে চিনতে পেরে নাম ধরে ডাক দিল। আমার পেছনে ছিল এক তরুণী। ঠান্ডায় তার ঠোঁটজোড়া জমে নীল হয়ে ছিল। স্পষ্টতই আমার নাম ধরে কেউ ডাকছে, এমনটা সে আগে কখনো শোনেনি। শোনামাত্র সে ভিড় ঠেলে আমার কাছে এসে ফিসফিসিয়ে (সেখানে সবাই ফিসফিস করেই কথা বলত) জিজ্ঞেস করল, 'এই যা হচ্ছে এখানে, আপনি কখনো কি তা বর্ণনা করতে পারবেন?' আমি বললাম, 'আমি পারব।' আমি দেখলাম, সে কথা শুনে হাসির মতো কিছু একটা মুহূর্তের জন্য খেলে গেল তার মুখের ওপর দিয়ে। একসময় যা মুখচ্ছবি ছিল তার ওপর দিয়ে!

এভাবেই দুঃখে-শোকে, উৎসবে-বিপ্লবে, বেদনায়-ক্ষোভে আখমাতভার 'রেকুইম' কবিতার জন্ম।

মারিনার দেশে ফেরা : ১৯৩৯-১৯৪১

১৯৮৯ সালে অ্যান্টার্কটিকা অভিযানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

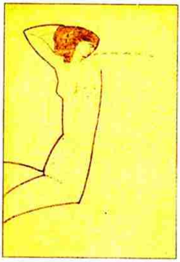

মদিলিয়ানির আঁকা আন্নার ন্যুড

জন্য পোল্যান্ডে একটি নৌজাহাজ তৈরি করা হলো। বরফ ভাঙার জাহাজকে হতে হয় প্রযুক্তির দিক থেকে সর্বাধুনিক আর ক্ষমতার দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী। তার নাম রাখা হলো—এক বিস্মৃতপ্রায় রুশ কবির স্মরণে—মারিনা সিভেতায়েভা। গত বিশ বছরে মারিনার কাব্যখ্যাতি ও অনুরাগীর সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। এর একটি বড় কারণ—মারিনার কবিতার প্রায় অননুকরণীয় বাকপ্রতিমা। তিনি পথিকৃৎ নারীবাদী কবি ও চিন্তকদের একজন, সেটাও একটা পার্শ্বকারণ। তবে তাঁর জীবনের ট্র্যাজিক পরিসমাপ্তিও তাঁকে পাঠ করার জন্য একটা বাড়তি তাগিদ সৃষ্টি করেছে। দেখতে আহামরি না হলেও ডানপিটে স্বভাবের ও আকর্ষণীয়া ছিলেন, সন্দেহ নেই। ১৯২০-এর দশকের গোড়ায় মান্দেলস্তাম ও ১৯২০-এর দশকের শেষে পাস্তেরনাক—উভয়েই তাঁর প্রেমে পড়েছিলেন, যদিও ভেবেচিন্তে উভয়কেই ফিরিয়ে দেন মারিনা। আসলে প্রথাগত জীবনে নিজেকে বেঁধে রাখার মানুষ ছিলেন না তিনি।

খুব অল্প বয়সেই সের্গেই এফ্রনের প্রেমে পড়েন মারিনা। এফ্রনের সঙ্গে বিবাহিত জীবনের একপর্যায়ে তিনি কিছুদিন আবার একত্র-বাস করেছিলেন অভিনেত্রী সোফিয়া পারনকের সঙ্গে। এই একত্রে থাকাটার মধ্যে 'বিশেষ কিছু' খুঁজে পেয়েছেন তাঁর জীবনীকারেরা। প্রায় সবাই উল্লেখ করেছিলেন, সমকামিতা ও বহুকামিতা—উভয় ক্ষেত্রেই মারিনার আগ্রহ ছিল তরুণ বয়সে। ইউরোপে যাওয়ার পর থেকে মারিনা অবশ্য চিরাচরিত বিবাহিত জীবনই কাটাতে থাকেন। এফ্রনের সঙ্গে তাঁর এক ছেলে মুর ও দুই মেয়ে আলিয়া ও ইরিনা হয়েছিল। ইরিনা অল্প বয়সেই মারা যান। মুর মারা যান পরে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফ্রন্টে। আর আলিয়া গ্রেপ্তার হয়ে গুলাগ শিবিরে কোনোমতে বেঁচে ছিলেন। কিন্তু স্বামী সের্গেই এফ্রনকে 'প্রতিবিপ্লবী' আখ্যা দিয়ে গুলি করে মারে এনকেভেদের গোয়েন্দা পুলিশ। প্রচণ্ড দারিদ্র্য ও অসুস্থতার মধ্যে একসময় আত্মহত্যা করেন মারিনা নিজে।

আমেদেও মদিলিয়ানি

চিরটাকাল অভ্যস্ততার বাইরে চিন্তা করতেই উৎসাহী ছিলেন মারিনা। তাঁর কবিতার ফর্ম যেমন চিরাচরিত বিন্যাসের বাইরে, রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রেও তিনি খুব অনায়াসেই প্রথাগত বাম-ডান লাল-সাদা বিভাজনরেখাকে অতিক্রম করে যেতে পারতেন। অক্টোবর বিপ্লবের আগে জারতন্ত্রের তীব্র সমালোচক ছিলেন, আবার অক্টোবর বিপ্লবের পরপর দ্রুত ঘটে যাওয়া পরিবর্তনগুলোকে সহজে মেনে নিতে পারেননি। বলশেভিক মস্কোয় বাস করে তিনি বলশেভিজমের বিরুদ্ধে কবিতা লিখেছিলেন—গৃহযুদ্ধে তাঁর স্বামী এফ্রন তখন হোয়াইট আর্মির পক্ষে লড়ে যাচ্ছিলেন রেড আর্মির বিরুদ্ধে। কিন্তু ১৯২২ সালে রাশিয়া ছেড়ে যখন পাশ্চাত্য ফ্রান্সে আশ্রয় নিলেন, তখন তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান বদলে গেল। তিনি হয়ে উঠলেন 'বুর্জোয়া-বিরোধী'। প্যারিসে বসবাসরত রুশি ইমিগ্র্যান্ট সমাজে মারিনাকে প্রায় একঘরে করে রাখা হয়েছিল। বিদেশে এসে স্বামী সের্গেই এফ্রনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আকস্মিক পরিবর্তনও এর জন্য দায়ী। একসময়ের বলশেভিক-বিরোধী অবস্থান থেকে এফ্রন ক্রমেই বলশেভিকদের পক্ষে অবস্থান নিচ্ছিলেন। এ রকম মত পরিবর্তন অবশ্য নতুন কিছু ছিল না। গোর্কি স্বয়ং অক্টোবর বিপ্লবের আগে *মেনশেভিক* বলে পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। একই কথা প্রযোজ্য মিরস্কির ক্ষেত্রেও। মিরস্কির বাবা ছিলেন জার আমলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনিও বলশেভিকদের সমর্থক হয়ে ওঠেন প্রবাসে ইমিগ্র্যান্ট হিসেবে থাকা অবস্থায়। প্রখ্যাত ইংরেজ সাহিত্য-সমালোচক এডমন্ড উইলসন মিরস্কিকে তাই নাম দিয়েছিলেন কমরেড প্রিন্স।

এফ্রন বা তাঁর মতো যাঁরা, তাঁদের এই অবস্থান পরিবর্তন ক্রেমলিনের দৃষ্টি এড়ায়নি। এফ্রন ও মিরস্কি মিলে প্যারিস থেকে বিশের-ত্রিশের দশকে *ভেরস্তি* (*মাইলপোস্ট*) নামে একটি সাময়িকী বের করতেন। সেখানে নিয়মিতভাবে সিভেতায়েভা ও পাস্তেরনাকের কবিতা ছাপা হতো। মোটামুটি এটা এখন প্রতিষ্ঠিত যে ১৯৩১ সাল থেকেই সের্গেই এফ্রন সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থার কাউন্টার-ইন্টেলিজেন্স শাখার হয়ে কাজ করতে শুরু করেন। ১৯৩৭ সালে পক্ষত্যাগী এক সোভিয়েত গুপ্তচর হত্যার সঙ্গে এফ্রন জড়িত ছিলেন, এই অভিযোগ এনে ফরাসি পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বের করে। এর ফলে এফ্রন ও তাঁর আরও কিছু সহকর্মী সোভিয়েত ইউনিয়নে পালিয়ে আসেন, কিন্তু মারিনা থেকে যান প্যারিসেই। মারিনা কীভাবে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পেলেন, সে নিয়ে একটি গল্প প্রচলিত আছে।

এফ্রন পালিয়ে যাওয়ার পর ফরাসি পুলিশ মারিনাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে আসে। বিশুদ্ধ ফরাসি ভাষায় মারিনা তাঁর নিজের ও তাঁর প্রিয় ফরাসি কবিদের কবিতা অনর্গল আবৃত্তি করতে থাকেন। তাতে করে ফরাসি পুলিশের ধারণা জন্মায় যে মারিনা আসলে বদ্ধোন্মাদ। যা হোক, এফ্রনের গোপন গোয়েন্দা কার্যকলাপ নিয়ে মারিনা কতটা পরিমাণে অবহিত ছিলেন, সে সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ আছে। তবে কোনো একটা যোগাযোগ যে গড়ে উঠেছিল এফ্রনের সঙ্গে বলশেভিক রাষ্ট্রের গোয়েন্দা দপ্তরের, সেটা অনুমান করা তীক্ষ্ণধী মারিনার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। মারিনা এফ্রন সম্পর্কে বলেছেন, 'সের্গেই ছিল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মহৎ ও নিঃস্বার্থ লোকেদের একজন। প্রথমে সে ভেবেছিল, হোয়াইট আর্মির বিজয়ের মধ্য দিয়েই রাশিয়ার মুক্তি আসবে। পরে যখন তার ভুল ভাঙল, সে নিজেকে সরিয়ে আনল সে পথ থেকে—এরপর কখনোই আর সেদিকে ফিরে তাকায়নি।'

তবে এটুকু বলা যায়, এফ্রনের গোয়েন্দা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মারিনা নিজেকে কখনো জড়াননি। এ ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব যুক্তি ছিল। দু-একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত বাদ দিলে রাজনীতিকে তিনি মনে করতেন এক 'নোংরা' ক্ষেত্র, যার সঙ্গে জড়াতে তাঁর ঘোরতর ব্যক্তিগত আপত্তি ছিল। তার পরও এটা বলা দরকার যে, পরবর্তী জীবনে প্রগতিশীল রাজনীতির প্রশ্নে, তাঁর মতো করে, স্পষ্ট পক্ষ নিতে তিনি পিছপা ছিলেন না। ইতালি ও জার্মানিতে চরম ডানপন্থী শক্তির উত্থানের পর তিনি স্পষ্ট অবস্থান নেন নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে। ১৯৩৯ সালে চেকোস্লোভাকিয়ায় হিটলারের জার্মানির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তিনি বেশ কিছু স্বভাববিরুদ্ধ 'রাগী কবিতা' লিখেছিলেন। স্পেনে ফ্রাংকোর শাসনের বিরুদ্ধে রিপাবলিকপন্থীদের লড়াইয়ে মারিনার সর্বাত্মক সমর্থন ছিল রিপাবলিকের জন্য যুদ্ধ করা আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের পক্ষে। সব মিলিয়ে, পরিপার্শ্ব সম্পর্কে মারিনার মধ্যে এক ধরনের 'নিজস্ব বিশ্লেষণ' ছিল—যা প্রচলিত বাম-ডান নিরিখে সব সময় বুঝে ওঠা কঠিন। তাঁর মতো করে তিনি জীবনের সব উপাদান—রাজনীতি, ভালোবাসা, ধর্ম, কবিতা, ইতিহাস সবকিছুকে—যেন তাঁর অঙ্গুলির নানা রঙের আংটির মতো ধারণ করেছিলেন। সেভাবেই বিভিন্ন বিরোধী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয়ে লেখা তাঁর কবিতা পড়তে হয় আমাদের। বিপ্লবের কবি মায়াকোভস্কি স্মরণে তিনি যেমন লিখেছিলেন, তেমনি লিখেছেন আখমাতভাকে উৎসর্গ করে।

আন্না মনে করতেন, মারিনাই তাঁর সমসাময়িক কালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিদের একজন। কবিতা লিখেছেন একসময় জারতন্ত্রের স্মরণে, আবার লিখেছেন জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান ছিল পূর্বাপর। তাই বলে 'বামপন্থী' শিরোপাও তাঁকে পরানো যাবে না। সাম্যবাদের পক্ষে যেমন কবিতা লিখেছেন, তেমনি কলম ধরেছেন সোভিয়েত দমন-পীড়নযন্ত্রের বিরুদ্ধে। এক কথায়, তাঁর সমসাময়িক যেকোনো কবির তুলনায় অনেক বেশি বহুমুখী ও জটিল ছিল তাঁর কবিতার ভুবন।

আজ যে প্রশ্নটা না উঠে পারে না, মারিনা সিভেতায়েভা কি জানতেন ১৯৩০-এর দশকের শেষভাগে সোভিয়েত ইউনিয়নে ফিরে গেলে শেষ পর্যন্ত সেটি তাঁর জন্য কী পরিণতি বয়ে আনতে পারে। অনুমান করি, কিছুটা জানতেন নিশ্চয়ই। নইলে বলবেন কেন পরবর্তী সময়ে, 'প্রবাসে যেমন, স্বদেশেও তেমনি, আমি সব সময়ই যারা ক্ষমতার শিকার হয়েছে তাদেরই দলে।' কিন্তু ১৯৩০-এর দশকের শেষভাগের শুদ্ধি অভিযানের নির্মমতা তাঁর মতো শক্তিশালী ও ধীময়ী কবিরও অপার কল্পনার বাইরে ছিল। ১৯৩৫ সালে বরিস পাস্তেরনাক যখন প্যারিসে আন্তর্জাতিক লেখক কংগ্রেসে যোগ দেন, মারিনার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় বহু বছর পরে। মারিনার মা ও বরিসের মা উভয়েই ছিলেন পিয়ানোর উঁচুদরের বাজিয়ে। এ দুই পরিবারের মধ্যে সখ্য ছিল বরাবর। পাস্তেরনাক ও মারিনা আশৈশব পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। দুজনে মিলে ১৯২৬ সালে জার্মান কবি রাইনের মারিয়া রিলকের মৃত্যুর আগে প্রায় এক বছর ধরে রুশ ও জার্মান ভাষায় চিঠিপত্র বিনিময় করেছেন। রিলকের কাছে লেখা পাস্তেরনাক ও সিভেতায়েভার চিঠি এবং তা নিয়ে আবার নিজেদের মধ্যে মান-অভিমান একটি চিত্তাকর্ষক আলোচনার বিষয়। মারিনার বিবেচনায়, পাস্তেরনাক ছিলেন সমসাময়িক রুশ কবিতার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি—মায়াকোভস্কিরও ওপরে রাখতেন তিনি পাস্তেরনাককে। পাস্তেরনাকও উচ্ছ্বসিত ছিলেন মারিনার কবিকৃতি নিয়ে—অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে মনে করেছেন তাঁর নিজের চেয়েও শ্রেয়তর কবিপ্রতিভা। প্যারিসে মারিনার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে পাস্তেরনাক বলেছিলেন, 'মস্কোয় এখন প্রচণ্ড শীত। এ সময়ে তোমার এ শরীর নিয়ে প্যারিসে থাকাই ভালো।' হয়তো তিনি প্রকারান্তরে বলতে চেয়েছিলেন, রাশিয়ায় মারিনার কোনোমতেই ফিরে যাওয়া উচিত হবে না। আর কেউ জানুক বা না জানুক, পাস্তেরনাক তো জানতেন কিরভ-হত্যার পর ঘরোয়া রাজনৈতিক পরিস্থিতি কীভাবে ঘোলাটে হয়ে এসেছে—শুরু হয়ে গেছে শুদ্ধি অভিযানের নামে দমন-পীড়ন-গ্রেপ্তার। মারিনা কি সেই ইঙ্গিত একেবারেই বুঝতে পারেননি, নাকি তিনি চলছিলেন এক অবধারিত নিয়তির দিকে?

নিকোলাই গুমিলিয়ভ, ছেলে লেভ ও আন্না আখমাতভা, ১৯১৩

১৯৩৭ সালে এফ্রন রাশিয়ায় চলে যাওয়ার পর থেকেই মারিনার ওপর চাপ সৃষ্টি হতে থাকে। তিনিও ফিরে আসবেন তাঁর স্বামী-পুত্র-কন্যার কাছে, এমনটা ভাবাই ছিল স্বাভাবিক। মারিনা তার পরও প্রায় দু বছর সময় নিলেন। তিনি মস্কোয় এলেন ১৯৩৯ সালের ১৮ জুন। প্রথমে কয়েকটা মাস ভালোই ছিলেন তাঁরা। কিন্তু ইয়েজভ আতঙ্কের আঘাতে কয়েক দিনের মধ্যেই তছনছ হয়ে যায় মারিনার পরিবার। ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে গ্রেপ্তার হলেন এফ্রনের মেয়ে আরিয়াদনা। আলিয়াকে ২০ দিন ধরে দৈহিক অত্যাচার করে স্বীকারোক্তি নিয়ে নেওয়া হলো, প্রবাসে থাকাকালে এফ্রন আসলে ছিলেন ডাবল এজেন্ট—ফ্রান্স ও রাশিয়া উভয়ের পক্ষেই তিনি গুপ্তচরবৃত্তিতে জড়িত ছিলেন। এর কিছুদিন পর অক্টোবর মাসে এফ্রনকে গ্রেপ্তার করা হলো। মারিনার অবশ্য এসব জানার উপায় ছিল না তখন। সদ্য প্রবাস থেকে এসেছেন। খুব একটা পরিচিত কেউ নেই তাঁর মস্কোতে। এখানে-ওখানে তাঁর স্বামী ও কন্যাকে ছাড়ানোর তদবির নিয়ে ঘুরলেন। ১৯৪০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর তাঁর বিখ্যাত দিনলিপিতে সিভেতায়েভা লিখেছেন, 'সবাই ভাবে যে আমি খুব সাহসী। আমার চেয়ে ভীতু লোক দ্বিতীয় কাউকে আমি জানি না। আমি সবকিছুতেই ভয় পাই। আমি ভয় পাই চোখের পলক, যা কিছু কালো, সিঁড়ির ধাপগুলো; সবচেয়ে বেশি ভয় পাই নিজেকে।' ওই একই দিনে লিখলেন আরও দুটি বাক্য, 'আমি মরতে চাই না। আমি শুধু চাই—না থাকতে।'

অন্য কোনো সময়ে এফ্রন হয়তো পেতেন একজন সোভিয়েত বীরের শিরোপা—সোভিয়েতের পক্ষে গোয়েন্দাগিরির কারণে তাঁর নাম কিম ফিলবির মতোই স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকত। কিন্তু ১৯৪১ সালের ১৬ অক্টোবর ফ্রান্সের পক্ষে সোভিয়েত-বিরোধী গুপ্তচরবৃত্তিতে জড়িত থাকার উদ্ভট অভিযোগে বুতিয়ার্কা জেলে থাকা অবস্থায় তাঁকে গুলি করে মারা হয়। মারিনার ১৬ বছরের ছেলে মুরও ছিলেন ওই সময়ে বুতিয়ার্কা জেলে। লাভরেন্তি বেরিয়া নিজ হাতে তাকে গুলি করে মারেন। এ নিয়েও একটা কথা কিছুদিন চালু ছিল, যদিও পরে সেটা ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

জার্মান বাহিনী তখন মস্কোর দ্বারপ্রান্তে মুর তাঁর দিনলিপিতে লিখেছেন (২০০৪ সালে প্রথম প্রকাশিত), 'মস্কো খালি হয়ে যাচ্ছে। একাডেমি অব সায়েন্স, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বলশই থিয়েটার—সবকিছু উধাও হয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ বলছে, জার্মান বাহিনী আজ রাতেই মস্কোতে ঢুকবে।' অন্যত্র মুর লিখেছেন, 'প্যারিসে থাকার সময় আমি ছিলাম কমিউনিস্ট। আমি অসংখ্য শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছি...আঁদ্রে জিদ, হেমিংওয়ে, ডস প্যাসোস—সবাই কমিউনিস্টদের কাছের লোক ছিলেন। তারপর নানা কারণে তাঁদের মোহমুক্তি ঘটে...আমারও এমন অবস্থা হয়েছে।' ১৯৪৪ সালে মুরের বয়স যখন উনিশ, সোভিয়েতের পক্ষে রণাঙ্গনে অংশ নেন তিনি এবং যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হন। বাবা ও মায়ের মতো তারও কবর কোথায়, আজ পর্যন্ত তা জানা যায়নি।

মারিনাকে অবশ্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়নি শুদ্ধি অভিযানের বছরগুলোয়। স্তালিনকে ব্যক্তিগত আবেদন জানিয়েও তিনি চিঠি লিখেছিলেন, 'আমার পরিবারকে বাঁচান।' সে চিঠি স্তালিন পর্যন্ত পৌঁছেছিল কি না তার প্রমাণ মেলে না। দুর্দিনে মারিনার পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউই ছিল না। মনে রাখতে হবে, মারিনা রাশিয়ায় এসেছিলেন কোনো বিতর্কিত কবি হিসেবে নয়; তাঁকে দেখা হতো মূলত প্রতিবিপ্লবী 'হোয়াইট এমিগ্রি' হিসেবে। ইলিয়া এরেনবুর্গ, নিকোলাই তিখনভ—যাঁরা দূর থেকে তাঁর কবিতা পছন্দ করতেন, তাঁরাও তাঁর সঙ্গ এড়িয়ে চলতেন। একমাত্র ভরসার স্থল ছিলেন পাস্তেরনাক। তিনি শুধু এটুকু করেছিলেন—মারিনার জন্য অনুবাদকের একটি কাজ জুটিয়ে দেওয়া। বোদলেয়ার ও লোরকার অনুবাদ এই সময়েই করেন মারিনা। এতে করে যেটুকু আয় হতো, তাতেই কষ্টেসৃষ্টে চলছিলেন তিনি। তত দিনে গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান ইয়েজভও বেঁচে নেই—তাঁর পরিবর্তে গোয়েন্দা দপ্তরের দায়িত্বে এসেছেন লাভরেন্তি বেরিয়া। বেরিয়াকেও একটি চিঠি লিখেছিলেন মারিনা, তাঁর পরিবারের সদস্যদের মুক্তি চেয়ে। সে চিঠি কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজে আসেনি। স্বামীর মৃত্যুসংবাদও তিনি পাননি মৃত্যুর আগে।

মারিনার শেষ দিনগুলো এখনো অস্পষ্ট। যেটুকু জানা যায় তা হলো ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে—তত দিনে জার্মানির সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ বেধে গেছে—তিনি ইয়েলাবুগা হয়ে চিস্তাপল শহরে আসেন। চিস্তাপল ছিল তাতার অটোনমাস রিপাবলিকের এক অখ্যাত শহর। যুদ্ধ বাধার পর রাইটার্স ইউনিয়নের অনেক সদস্যকে এখানে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অন্য সদস্যদের—যেমন আখমাতভা ও পাস্তেরনাককে—তাসখন্দে সরিয়ে নেওয়া হয়। মারিনা চিস্তাপল শহরে থাকার অনুমতি চেয়ে রাইটার্স ইউনিয়নের কাছে আবেদন করেন। কিন্তু সেখানে ন্যূনতম চলার মতো কোনো কাজ জোটাতে পারেননি তিনি। এমনকি, কথিত আছে, একপর্যায়ে তিনি বাসন-মাজা কাপড়-ধোয়ার মতো চাকরিও খুঁজেছিলেন। পেলেও সে ধরনের কাজ বেশি দিন তিনি করতে পারতেন না। রাশিয়ায় আসার পর থেকেই তাঁর শরীর ও মন ক্রমেই ভেঙে পড়ছিল।

যা হোক, এর কিছুদিন বাদেই আবার ইয়েলাবুগা শহরে ফিরে যান মারিনা এবং সেখানেই আত্মহত্যা করেন। লিদিয়া চুকভস্কায়া ওই সময় ছিলেন চিস্তাপলে। তাঁর মতে, মারিনা তখন মানসিকভাবে অত্যন্ত ভেঙে পড়েছিলেন। যুদ্ধের কারণে মস্কো ছেড়ে যাওয়ার সময় থেকেই তাঁর বাঁচার ইচ্ছে কমে আসছিল। লিদিয়াকে তিনি বলেওছিলেন, 'এখন আমি ঝুলে পড়ার মতো একটা হুক খুঁজছি।' মৃত্যুর কয়েক দিন আগে লিদিয়াকে বলেছিলেন, 'আমি এখানে কোনো কিছুই পাব না। যদিও বা একটি রুম দেয় তারা, কোনো কাজ আমি পাব না। এসবের পরও কি আমার বেঁচে থাকা উচিত?' মৃত্যুর আগে তাঁর ছেলে মুরের কাছে লেখা এক বিষণ্ন চিঠিতে সিভেতায়েভা লিখেছিলেন, 'আমাকে ক্ষমা করে দিস। এভাবে চলতে থাকলে অবস্থা আরও শোচনীয় হতো...আমি প্রচণ্ড অসুস্থ। আমি আর আমাতে নেই। তোকে আমি প্রচণ্ড ভালোবাসি। বাবা ও আলিয়ার সঙ্গে দেখা হলে বলিস, আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওদের খুব ভালোবাসি। তাদের বুঝিয়ে বলিস, কেন দেয়ালে আমার পিঠ ঠেকে গিয়েছিল।'

আখমাতভা তখন তাসখন্দে। মারিনার মৃত্যুসংবাদ যখন পৌঁছাবে, তখন তাঁর মনে হবে ক্লিওপেট্রার আত্মহননের কথা। মারিনার সঙ্গে তাঁর সরাসরি সাক্ষাৎ হয়েছিল একবারই। ১৯৪১ সালের শুরুতে মস্কোয় অভিনেত্রী নিনা ওলশেভস্কায়ার ফ্ল্যাটে তিনি মারিনার সঙ্গে পুরো একটা দিন কাটিয়েছিলেন। মস্কো আর্ট থিয়েটারে তখন চলছিল শেক্সপিয়ারের *আ মিডসামার নাইট'স ড্রিম*। নিনা তাতে অভিনয় করছেন। সারা দিন একটা ঘরে মারিনার সঙ্গে আড্ডা দিলেন আন্না। সন্ধ্যার পর বেরোলেন নাটক দেখতে। মারিনা যাননি সে সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে থিয়েটারে। কিন্তু এক সঙ্গেই তাঁরা বের হলেন নিনার বাড়ি

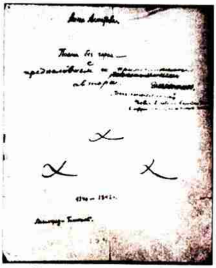

'যে কবিতার নায়ক নেই'-এর পাণ্ডুলিপি

থেকে। রাস্তায় নামার পর তাঁর মনে হলো, পেছনে কেউ যেন তাঁদের অনুসরণ করছে। আন্নার মনে আছে, তিনি নিনাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'কার পেছনে ফেউ লেগেছে? আমার, নাকি মারিনার?' এরপর আর কখনো দেখা হয়নি তাঁর মারিনার সঙ্গে।

মারিনা তাঁর কবিতার পাণ্ডুলিপির একটা বড় অংশ রেখে গিয়েছিলেন প্যারিসে। রাশিয়ায় আসার পর যেসব কবিতা লিখেছিলেন—তার কোনোটাই তখন প্রকাশিত হয়নি। ১৯২২ সালে মস্কো ছাড়ার আগে নিতান্ত বিত্তহীন ছিলেন না তিনি। যথেষ্টই সম্পত্তি তিনি পেয়েছিলেন বাবার সূত্রে। এক চিঠিতে ভেরা মারকুয়েভকে যা লিখেছিলেন তা এ রকম, 'আমার বাবা মিউজিয়াম অব ফাইন আর্টস তৈরি করেছিলেন। ১৪ বছর ধরে তাঁর সংগ্রহ নিয়েই গড়ে উঠেছিল এই মিউজিয়াম। আমি কোনো শরণার্থী হয়ে মস্কোয় আসিনি। রুমায়েনসেভ মিউজিয়ামও আমাদের পারিবারিক লাইব্রেরির সব বইপত্র দিয়েই গড়ে উঠেছে। আমরা মস্কোকে অনেক কিছু দিয়েছি, কিন্তু এখন আমাকেই ছুড়ে ফেলা হচ্ছে...এটা আমার দুর্ভাগ্য যে আজ আমার কিছু অবশিষ্ট নেই—কেবল এই হৃদয় ও বিধিলিপিটুকু ছাড়া।'

বারবার আবেদন করেও মস্কোয় বসবাস করার অনুমতি মেলেনি তাঁর।

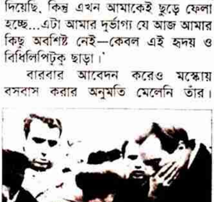

আন্নার শেষকৃত্য, ডানে জোসেফ ব্রদস্কি

মস্কোয় থাকাকালে যেসব কবিতা লিখেছিলেন সেগুলো তিনি দিয়ে যান তাঁর কবিতার সংগ্রাহক ও অনুরাগী সাহিত্য-সমালোচক আনাতোলি তারাসেনকভের কাছে। উদ্দেশ্য, তাঁর ভাগ্যে যদি কিছু অঘটন ঘটে, তবে আনাতোলি অন্তত এসব লেখার একটা নিষ্পত্তি করতে পারবেন। যেকোনো সময়ে গ্রেপ্তার হতে পারেন, এ রকম আশঙ্কা তখন তাঁকে তাড়া করে ফিরছিল। পাস্তেরনাক চেয়েছিলেন, মস্কোয় আসার পর সিভেতায়েভা দ্রুত একটি কবিতার বই প্রকাশ করুক। এতে করে তাঁর পুনরুজ্জীবনের উপায় খুলে যাবে। মারিনা সেই পরামর্শ অনুযায়ী কাজও করে যাচ্ছিলেন। স্বামী ও মেয়ে জেলে, কোথায় আছেন তা তাঁর জানা নেই, ছেলেকে স্কুলে দেওয়া যাচ্ছে না, নিয়মিত রোজগারের ব্যবস্থা নেই, এ রকম পরিস্থিতিতেও মারিনা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছিলেন একটি কাব্যগ্রন্থের ওপর। তাঁর নোটবুকের এক জায়গায় লিখছেন এ প্রসঙ্গে:

> আমি এসবের মধ্যেই বইটা নিয়ে কাজ করছি। লাইন অদল-বদল করছি, প্রুফ দেখছি, টাইপ করছি নিজের টাকা খরচ করে, সংশোধন করছি আবারও এবং প্রায় নিশ্চিত যে আমার এই পাণ্ডুলিপি ওরা (মানে গসলিত-ইজদাত বা স্টেট পাবলিশিং হাউস) প্রকাশের জন্য নেবে না। এটা একটা অলৌকিক ব্যাপার হবে, যদি তারা সেটা নেয়। যাক, আমি আমার যেটুকু করার সেটা করেছি—আমার সদিচ্ছা দেখিয়ে গেছি।

বাদবাকিটা মারিনার হাতে ছিল না। মারিনা নিজেও জানতেন সেটা, বলেওছিলেন, 'মাইন যেমন টুকরো টুকরো খণ্ডে বিদীর্ণ হয়ে যায়, আমার কবিতাগুলোও তেমনি হৃদয় বিস্ফোরিত হয়ে যাওয়া একেকটি রজতখণ্ড।'

*ডক্টর জিভাগো*র পাস্তেরনাক: ১৯৫৭-১৯৬০

পাঁচের মধ্যে তিন গেল, রইল বাকি দুই। একে একে মারা গেলেন গুমিলিয়ভ, মান্দেলস্তাম ও সিভেতায়েভা। বাকি থাকলেন দুজন—আখমাতভা ও পাস্তেরনাক। মারিনা সিভেতায়েভার আত্মহত্যা বিচলিত করেছিল অনেককেই। চিস্তাপল শহরে যাঁরা ছিলেন তাঁরা নিজেদের অপরাধী ভাবতে শুরু করলেন এই ভেবে যে, কেন তাঁরা সেদিন মারিনার পাশে দাঁড়াতে পারেননি, মানসিক ও বৈষয়িকভাবে। বিশেষ করে পাস্তেরনাক নিজেকে কখনো ক্ষমা করতে পারেননি সিভেতায়েভার পাশে তাঁর বিপদের দিনে আরও জোরালোভাবে দাঁড়াতে পারেননি বলে। এক হিসেবে, পুরো 'সিস্টেম'টাই মারিনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এ রকম অপরাধবোধ কাজ করেছিল আখমাতভার ও এরেনবুর্গের মধ্যেও। ১৯৫৬ সালে এরেনবুর্গ *লিটারেরি মস্কো*র দ্বিতীয় সংখ্যায় মারিনার কয়েকটি কবিতা ছাপলেন, একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধও লিখলেন তাঁর সম্পর্কে। ১৯৫৬ ও ১৯৫৭ সালে দুটো কাব্যসংকলন বের হলো তাঁর। তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিস্তাপল

মারিনার বেশির ভাগ কবিতাই প্রকাশের অপেক্ষায় থাকল। ১৯৬০-৭০-এর দশকের সোভিয়েত ইউনিয়নে নিষিদ্ধ লেখা প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম ছিল 'সাম-ইজদাত' বা হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপির স্টেনসিল কপি করে বিতরণ। এই সময়ে সোভিয়েত তরুণ সমাজে সবচেয়ে জনপ্রিয় কবিদের একজন হয়ে ওঠেন সিভেতায়েভা। ইয়েভগেনি ইয়েভতুশেংকো, আন্দ্রেই ভজনেসেন্স্কি, বেল্লা আখমাদুলিনা প্রমুখ কবির ওপর গভীর প্রভাব ফেলে মারিনার কবিতা। আখমাতভা অনুরাগী নোবেল বিজয়ী রুশ কবি জোসেফ ব্রদস্কির ক্ষেত্রেও এটা সত্য।

স্তালিন আমলের শুদ্ধি অভিযানের বছরগুলো পাস্তেরনাক নিরাপদে পার করে দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু স্তালিনের মৃত্যুর পরে পাস্তেরনাককে আরেকভাবে তিরিশের শুদ্ধি অভিযানের তিক্ত স্বাদ কিছুটা হলেও অনুভব করতে হয়েছিল। সেটা প্রধানত *ডক্টর জিভাগো* উপন্যাসের কারণে। স্তালিনের সময়ে কেন তাঁকে সে রকম কোনো পরিণতির মুখোমুখি হতে হয়নি, সেটা একটা আগ্রহ-জাগানিয়া প্রশ্ন। এ প্রশ্ন রাখা যায় আরও কিছু লেখক সম্পর্কেও। এর মধ্যে পড়বেন মিখাইল বুলগাকভ, মিখাইল শলোখভ ও এরেনবুর্গ। এঁদের সে সময় বিতর্কিত ও অনেক ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করা সত্ত্বেও রাজদ্রোহের অভিযোগে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়নি। এক হিসেবে, তিরিশের শুদ্ধি অভিযানের কালে কারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন এবং কারা হননি তার 'গ্রামার' বোঝা দুরূহ ব্যাপার। পাস্তেরনাকের বেলায় বলা যায়, তিনিই প্রথম রুশ কবি যিনি জর্জীয় ভাষা থেকে কবিতা অনুবাদে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। জর্জীয় কবিতার মণিমুক্তোগুলো তাঁর সুবাদেই রুশ কবিতার বৃহত্তর পাঠকসমাজে পরিচিতি পেতে শুরু করে। সে জন্য জর্জীয় স্তালিনের বিশেষ সহানুভূতি তিনি হয়তো পেয়ে থাকবেন। তা ছাড়া পাস্তেরনাকের কাছের মানুষেরা বলেছেন, তিনি সত্যিকারভাবেই স্তালিনকে 'নায়কের চোখে' দেখতেন। ১৯৩০-এর দশকে সোভিয়েতের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটতে থাকে। যা ছিল একটা কৃষিপ্রধান সমাজ, তা দ্রুত পরিণত হয় শিল্পভিত্তিক সমাজে। সাধারণ মানুষের আয় বা জীবনযাত্রার মান বাড়তে থাকে। এসবের পেছনে স্তালিনের 'নির্ধারক' ভূমিকা ছিল বলে মনে করেন পাস্তেরনাক।

নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, স্তালিন ছিলেন একজন অতিশয় রহস্যময় চরিত্র। গুমিলিয়ভ ফায়ারিং স্কোয়াডে মারা গেলেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রী আখমাতভা নিগৃহীত হয়েও বেঁচে রইলেন। মান্দেলস্তাম স্তালিনের বিরুদ্ধে কবিতা লিখেও ফায়ারিং স্কোয়াড এড়ালেন, যদিও প্রবল ঠান্ডায় জমে শেষটায় মারা গেলেন সাইবেরিয়ার গুলাগ বন্দিশিবিরে। পাস্তেরনাক শিল্পকলামগ্ন নিভৃতচারী লাজুক স্বভাবের কবি। মায়াকোভস্কির মতো দৃপ্ত নন তিনি চলনে-বলনে। মায়াকোভস্কির আত্মহত্যার পর তাঁকেই স্তালিন মনোনীত করলেন সোভিয়েত কবিকুলের প্রধান হিসেবে। উপন্যাসে তিনি একইভাবে—মতপার্থক্য সত্ত্বেও—বাঁচিয়ে রাখলেন মিখাইল বুলগাকভকে। কিন্তু সহায়তা পেলেন না মারিনা সিভেতায়েভা—প্রবল অর্থকষ্টে ও মানসিক পীড়নে স্বেচ্ছামৃত্যুই বেছে নিতে হলো তাঁকে। অন্যদিকে, এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও অক্ষত থেকে গেলেন ইলিয়া এরেনবুর্গ। পরবর্তীকালে নিজের প্রাণে বেঁচে যাওয়াকে 'অলৌকিক' বলেছেন এরেনবুর্গ। কেউ বলতে পারেন, এত সব শিল্পী-সাহিত্যিকের খুঁটিনাটি স্তালিনের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, জানলেও সব সময় মনে রাখা সম্ভব নয়। এঁদের দুর্দশার জন্য দায়ী সিক্রেট পুলিশ, স্তালিনের পক্ষে অনেক কিছু দৈনিক ভিত্তিতে জানা সম্ভব ছিল না। সিক্রেট পুলিশ যে অস্বাভাবিক রকমের বাড়াবাড়ি করেছিল এবং এক রকমভাবে 'রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র' হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা এখানে কোনো গৌণ কবিকুলের কথা বলছি না। গুমিলিয়ভ, আখমাতভা, সিভেতায়েভা, মান্দেলস্তাম এঁরা বিশ শতকের মুখ্য কবিদের মধ্যে পড়েন—রুশ ও সোভিয়েত কবিকুলের মধ্যে এঁরা ছিলেন পূর্বাপর অগ্রগণ্য। এঁদের বিধিলিপি কী বার্তা বয়ে আনছে, সেটা সোভিয়েত রাষ্ট্রের নজর এড়িয়ে যেতে পারত না। 'ইন্টেলিজেনশিয়া' সম্পর্কে স্তালিন ছিলেন অতিমাত্রায় সজাগ ও সতর্ক। সিভেতায়েভা বা মান্দেলস্তামের জীবনে কী ঘটছে, তা একসময় তাঁর চোখে পড়তই।

যাঁরা বেঁচে রইলেন, তাঁদের মধ্যে একটা অপরাধবোধ আমৃত্যু কাজ করেছে 'কেন তাঁরা বেঁচে রইলেন' এ নিয়ে। এটা কাজ করেছে এরেনবুর্গের মধ্যে যেমন, পাস্তেরনাকের মধ্যেও তেমনি। এই অপরাধবোধ থেকেই কি পঞ্চাশের দশকে এরেনবুর্গ লিখেছিলেন *বরফ-গলার সময়* বা পাস্তেরনাক তাঁর একমাত্র উপন্যাস *ডক্টর জিভাগো*? যখনই মনে পড়ে কীভাবে মারা গেছেন মান্দেলস্তাম, তাঁদের মন ভারী হয়ে উঠেছে। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসের কোনো এক দিনে মান্দেলস্তাম তাঁর শেষ চিঠিটা লিখেছিলেন ভাই ইয়েভগেনিকে। অলৌকিকভাবে সে চিঠিটা তাঁর ভাইয়ের কাছে পৌঁছেছিল। সেখানে প্রচণ্ড শীতের কষ্টের কথা লেখা ছিল:

> ভাই শুরা, আমি এখন ভ্লাদিভোস্তক গুলাগের দ্বিতীয় ব্যারাকে। প্রতিবিপ্লবী কর্মকাণ্ডের জন্য পাঁচ বছরের সাজা

মারিনা সিভেতায়েভা

সোফিয়া পারনক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেওয়া হয়েছে আমাকে। মস্কোর বুতিয়ার্কা জেল থেকে ৯ সেপ্টেম্বর আমাকে পাঠানো হয়; এখানে পৌঁছাই ১২ অক্টোবর। আমার শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ। সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত ও ক্ষয়ে যাওয়া বলতে যা বোঝায়। দেখলে চিনতে পারবে না। আমি বুঝতে পারছিও না যে, আমাকে এখানে খাবারদাবার, কাপড়চোপড় বা অর্থ পাঠিয়ে কোনো লাভ হবে কি না। আমাকে তুমি বরং কিছু গরম জামাকাপড় পাঠানোর চেষ্টা করতে পারো। আমি ঠান্ডায় জমে যাচ্ছি...।

এই ঠান্ডায় জমে যাওয়া কবি বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। নোবেল বিজয়ী মার্কিন কবি মারউইন পরে ২০০৪ সালে *মান্দেলস্তামের নির্বাচিত কবিতা* অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। মারউইন মান্দেলস্তামকে দেখেছেন 'কবিদের কবি' হিসেবে। তাঁর প্রভাব খুঁজে পেয়েছেন পল সেলান ও রবার্ট লাওয়েলের মতো কবিদের মধ্যে। সমালোচকদের মতে, মারউইনের শেষ দিকের কবিতাও হয়ে উঠেছে মান্দেলস্তাম-বিদ্ধ, তাঁর আত্মমগ্ন কবিতার মধ্যে ঢুকে গেছে সমাজ ও ইতিহাস।

বুলনাকভ, এরেনবুর্গ ও পাস্তেরনাক সে তুলনায় ছিলেন ভাগ্যবান। মান্দেলস্তামের পরিণতি তাঁদের বরণ করতে হয়নি। এ ব্যাপারে আখমাতভা শেষ দিকে মাঝেমধ্যেই কটু মন্তব্য করেছেন পাস্তেরনাক সম্পর্কে। অবশ্য জনসমক্ষে নয়, একান্ত আলাপচারিতায়। পাস্তেরনাক ১৯৬০ সালের ৩০ মে মারা গেছেন। এর ঠিক এক মাস পর নিজের জীবনের দুঃখকষ্টের সঙ্গে পাস্তেরনাকের 'ভালো থাকা' জীবনের তুলনা করে লিদিয়া চুকভস্কায়াকে বলেছেন, জিভাগোর পাস্তেরনাককে 'শহিদ' বানানোর দরকার নেই, কেননা তাঁর তো 'সবকিছুই প্রকাশিত হচ্ছিল, এখানে না হলে—ওখানে...তাঁর ওপর কখনো তাঁকে অর্থকষ্টে ভুগতে হয়নি...যদি তুমি তাঁর সঙ্গে অন্যদের তুলনা করে দেখো—মান্দেলস্তামের ভাগ্য দেখো...সিভেতায়েভার ভাগ্য দেখো—যাকেই নাও না কেন, তুলনায় পাস্তেরনাকের প্রতি ভাগ্য ছিল অতি প্রসন্ন।'

তার মানে এই নয় যে, পাস্তেরনাকের প্রতি তাঁর আন্তরিক সমবেদনা ছিল না। পাস্তেরনাকের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর সচরাচর যেটা হয় না আখমাতভার চক্ষু সজল হয়ে উঠেছিল। ১৯৬০ সালের ১১ জুন—আখমাতভা নিজেও তখন হাসপাতালে—তিনি একটি কবিতা লিখলেন পাস্তেরনাককে স্মরণ করে। *ডক্টর জিভাগো* উপন্যাসের কারণে পাস্তেরনাকের মৃত্যুতে অতি শীতলতা দেখিয়েছিল সোভিয়েত রাইটার্স ইউনিয়ন, সরকারিভাবে কোনো শোকসভা পর্যন্ত হয়নি। আন্না কবিতায় যা লিখলেন তার মর্মানুবাদ এ রকম :

> গতকাল একটি অননুকরণীয় স্বর স্তব্ধ হয়ে গেছে। যে মানুষটা বনভূমির সঙ্গে কথা বলতেন, তিনি আমাদের পরিত্যাগ করে গেছেন। তিনি ছিলেন

স্বামী এফ্রনের সঙ্গে মারিনা

> গমের ভেতরে জীবনদায়িনী শস্যকণা, অথবা ছিলেন প্রথম বৃষ্টির ধারা, যা নিয়ে তিনি অনেক গান বেঁধেছিলেন। পৃথিবীর সব ফুল খুশিতে আন্দোলিত হয়ে উঠছে তাঁর মৃত্যুতে, তাঁকে পেয়ে। কিন্তু এখানে, এই সামান্য গ্রহে, যাকে আমরা বলি পৃথিবী, হঠাৎ করে সবকিছু নিস্তব্ধ হয়ে গেছে।

আখমাতভার নানা বিপদের দিনে, মান্দেলস্তাম বা সিভেতায়েভার সংকটে যতটুকু পেরেছেন সে সহায়তাটুকু একমাত্র পাস্তেরনাকই দিয়েছেন, এ কথা তিনি ভুলে যান কী করে?

গত শতকের বিশ-তিরিশ-চল্লিশের দশকে ভিন্নমতের শিল্পী-সাহিত্যিকদের ওপর—কারণে বা কারণ ছাড়াই—যেসব অত্যাচার নির্যাতন বা নির্বাসনে পাঠানোর ঘটনা ঘটেছিল তাতে ভেতরে ভেতরে এক ধরনের প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল পাস্তেরনাকের মধ্যেও। তারই ফসল *ডক্টর জিভাগো*। কেবল অপরাধবোধ লাঘবের জন্য বা দায়মোচনের জন্য উপন্যাসটি লেখা হয়নি। বিশ-তিরিশ দশকে পাস্তেরনাকের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বা লেখার মধ্যে আমরা জিভাগোর ক্রমে 'হয়ে ওঠা'র পূর্বলেখ পাই। ১৯২২ সালে মারিনা সিভেতায়েভার মতোই তিনি একপর্যায়ে রাশিয়া ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বার্লিনে যাওয়ার ঠিক আগে ত্রৎস্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাঁর। ত্রৎস্কি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন তাঁর কবিতায় কোনো সামাজিক বিষয়ের ছায়া পর্যন্ত নেই? পাস্তেরনাকের উত্তর ছিল, 'আমি অকৃত্রিম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ হচ্ছে নতুন সমাজদেহের এক নতুন সামাজিক কোষ।' বার্লিনে গিয়ে অবশ্য তাঁর মন বসেনি। প্যারিসের মারিনার মতোই রাশিয়ান এমিগ্রি জীবন, প্রবাসী রুশিদের মধ্যে দল-মত নিয়ে দলাদলি, বিশের দশকের জার্মানির অর্থনৈতিক সংকট—সবকিছু মিলিয়ে অসহ্য বোধ হচ্ছিল পাশ্চাত্যের জীবন। শেষ পর্যন্ত তিনি ঠিক করলেন আবার রাশিয়াতেই ফিরে যাবেন। হয়তো আখমাতভার মতো তিনিও ভেবেছিলেন, মাতৃভাষায় লিখবে যে কবি বা লেখক তাঁকে স্বদেশি সংস্কৃতির মধ্যেই জলের মধ্যে মাছের মতো বসবাস করতে হয়।

তিরিশের দশকে পাস্তেরনাককে রাইটার্স ইউনিয়নের পরিচালনা বোর্ডের সদস্য করা হয়। সে সুবাদে অনেকগুলো অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তাঁকে। কখনো প্রতিবাদ করেছেন, কখনো মুখ বুজে সয়ে যেতে হয়েছে। জিনোভিয়েভ ও কামেনেভের মৃত্যুদণ্ডের আগে রাইটার্স ইউনিয়নের প্রভাবশালী সদস্য হিসেবে তাঁকেও বিবৃতিতে সই করতে হয়েছে মৃত্যুদণ্ড চেয়ে। পাস্তেরনাকের ছেলে শিল্প-সমালোচক ইয়েভগেনি পাস্তেরনাক অবশ্য বলেছেন, পাস্তেরনাক বিবৃতিতে সই করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং তাঁর অনুমতি ছাড়াই বিবৃতিতে তাঁর নাম ছাপা হয়। তবে রাশিয়া সম্পর্কে আঁদ্রে জিদের সমালোচনামূলক বইয়ের বিরুদ্ধে বিবৃতিতে সই থেকে তিনি বিরত থাকেন, যেমন অবিচল থাকেন ১৯৩৭ সালে মার্শাল তুখাচেভস্কিসহ কয়েকজন প্রথম সারির সোভিয়েত জেনারেলের মৃত্যুদণ্ডের সমর্থনে রাইটার্স ইউনিয়নের বিবৃতিতে সই না দেওয়ার সিদ্ধান্তে। চারপাশে তাঁর প্রিয় মানুষগুলো ১৯৩১-এর দশকের আতঙ্কজনক শাসনের শিকার হচ্ছিল। আর তিনি অসহায় হয়ে তা চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। যেমন দেখেছেন ১৯২০-এর দশকে প্রখ্যাত লেখক ইয়েভগেনি জামিয়াতিন ও বরিস পিলনিয়াকের অপমান ও রাষ্ট্রের তরফ থেকে তীব্র নেতিবাচক সমালোচনা। কিছুই করতে পারেননি, তবে তাঁদের কাছে বা তাঁদের উৎসর্গ করে কবিতা লিখেছেন। ১৯৩১ সালে *নোভি মির* পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কবিতা 'জনৈক বন্ধুর প্রতি' আসলে অপমানিত ঔপন্যাসিক বরিস পিলনিয়াককে উৎসর্গ করে রচিত। সেখানে তিনি লিখেছেন সেই বিখ্যাত পঙ্ক্তিমালা, যার নির্যাস এ রকম :

> যেন আমার জানা নেই অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ালেই মূর্খতা কখনোই আলো খুঁজে পায় না অথবা আমি যেন সত্যি সত্যি এক দানব যার কাছে লক্ষ লোকের সুখ শ্রেয়তর নয় একশ লোকের শূন্যকুম্ভ সুখের চেয়ে? আমি কি পাঁচসালা পরিকল্পনাকে বিচারের মাপকাঠি ধরি না, আমি কি এর সঙ্গে আমার ভাগ্যের গাঁটছড়া বাঁধিনি? কিন্তু আমি আমার বুকের খাঁচার ব্যাপারে কী করব, আর এই স্বভাবের ব্যাপারেই বা কী করব, যা জড়তার চেয়ে আরও স্থবির? এটা দুর্ভাগ্য যে ক্রান্তিকালগুলোতে যখন উচ্চতর আবেগকে বেশি প্রাধান্য দিতে হয়, তখনো কবিদের চাকরি যায় না; এ সময়ে কাব্যকলার চাকরি বিপজ্জনক—যদি বা সেই পদ শূন্য নাও হয়।

বিশেষ করে তাঁকে কষ্ট দিয়েছিল এককালে যাঁর প্রেমে পড়েছিলেন—সেই মারিনা সিভেতায়েভার আত্মহত্যা। 'সবচেয়ে বিষাদময় মুহূর্ত' ছিল সেটা, বলেছেন *পিপল অ্যান্ড অ্যাটিচুড* বইয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যদিক থেকেও পাস্তেরনাকের জীবনের ওপর তিরিশের দশকের কালো ছায়া পড়েছিল। ১৯৩৯ সালের জানুয়ারি মাসে প্রখ্যাত রুশ নাট্যকার মেইয়েরহোল্ড স্থির করলেন লেনিনগ্রাদের পুশকিন থিয়েটারে *হ্যামলেট* মঞ্চস্থ করবেন। এর জন্য পাস্তেরনাকের দ্বারস্থ হলেন তিনি। শেক্‌সপিয়ারের প্রতি তাঁর আগ্রহের কথা আগেই শুনেছেন তিনি। পাস্তেরনাকের *হ্যামলেট* ও *কিং লিয়ার* শেক্‌সপিয়ার অনুবাদের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা। পরবর্তীকালে ১৯৬০-এর দশকে—*ইনোকেন্তি স্মাকতুনভস্কি* অভিনীত—বিখ্যাত রাশান *হ্যামলেট* সিনেমারও সংলাপ রচিত হয়েছিল পাস্তেরনাকের অনুবাদ অবলম্বনে। সত্তর দশকের দেশে আরেকজন রুশ আইকন গায়ক ও অভিনেতা ভ্লাদিমির ভিসোৎস্কি *হ্যামলেট* নাটকের নাম-ভূমিকায় নিয়মিত অংশ নিতেন মস্কোর আভাঁগার্দ থিয়েটার 'তাগানকা'য়। সেই নাটকও পাস্তেরনাকের অনুবাদের ওপরই গড়ে উঠেছিল।

মেইয়েরহোল্ডের অনুরোধে পাস্তেরনাক সে সময় অনুবাদে হাত দিলেন ঠিকই, কিন্তু বিপর্যয় নেমে এল অন্যদিক থেকে। মেইয়েরহোল্ড নিজেই গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন ১৯৩৯ সালের জুন মাসে এবং কারাবদ্ধ অবস্থাতে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যু হলো তাঁর। এ ঘটনা বহির্বিশ্বে অজানা থাকেনি। এমনকি এ দেশেও। কবি অমিয় চক্রবর্তী তখন ছিলেন ইউরোপে। ১৯৩৭-৩৯ সালের শো-ট্রায়ালের কথা তিনি শুনতে পেয়েই সবিস্তারে রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন। শত প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও পাস্তেরনাক ১৯৩৯ সালেই নাটকটির অনুবাদ শেষ করে আনেন মেইয়েরহোল্ডের প্রতি ব্যক্তিগত 'কমিটমেন্ট' থেকে এবং ১৯৪০ সালের শুরুতে এক অনুষ্ঠানে নাটকটির পাণ্ডুলিপি থেকে পাঠ করে শোনান।

সুতরাং ক্ষমতাযন্ত্রের ওপর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিকভাবে ক্ষুব্ধ হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল পাস্তেরনাকের। ১৯৪৫ সালের শরৎকালে শুরু হয় *ডক্টর জিভাগো*র পাণ্ডুলিপি রচনার কাজ। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বরে এর প্রথম দিকের অধ্যায়গুলো 'সাম-ইজদাতের' কল্যাণে মস্কোয় বিতরিত হতে শুরু করে। জিভাগো ছিলেন বিপ্লবতাড়িত রুশ বুদ্ধিজীবীদের আদর্শস্থানীয় চরিত্র—একাধারে ডাক্তার, কবি, বিপ্লবের প্রতি আদিতে সহানুভূতিশীল, সোভিয়েত আমলের প্রথম দিকের বৈষয়িক দুঃখ-দুর্দশায় পীড়িত এক পরিবারকেন্দ্রিক মানুষ, ১৯১৮-২১ সালের দীর্ঘ গৃহযুদ্ধে রেড আর্মির পক্ষে বাধ্য হয়ে অংশগ্রহণকারী, জার আমলের বুর্জোয়া শ্রেণীর নিন্দিত সদস্য, একাধিক নারীর প্রতি প্রেমে ও দোটানায় দ্বিধান্বিত। এসব কিছুর মধ্য দিয়ে গিয়েও যাঁর রচনা ও কল্পনাশক্তি এখনো নৈতিক মানে ও শিল্পগুণে অমলিন। কিন্তু যাঁর জন্য *ডক্টর জিভাগো* পাশ্চাত্যে ও সোভিয়েত ইউনিয়নে আলোড়ন তুলেছিল তার কারণ নিহিত ছিল অন্যত্র। স্তালিন-আমলে সৃষ্ট সমাজতন্ত্রের মডেলের পূর্বছায়া তিনি

হাঙ্গেরির বিদ্রোহ: স্তালিনের মূর্তি ভেঙে ফেলেছে ক্ষুব্ধ জনতা, ১৯৫৬

দেখেছিলেন অক্টোবর বিপ্লবের রক্তাক্ত টানাপোড়েনের মধ্যে। জিভাগো ট্র্যাজিক চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল এ কারণেই। অর্থাৎ বিষয়টা শুধু ব্যক্তি স্তালিন, এমনকি গোয়েন্দা পুলিশের দোর্দণ্ড প্রতাপের সমস্যা নয়। যা ঘটেছে ১৯৩০-৪০-এর দশকে তার একটা যোগসূত্র রয়েছে ১৯১৭ সাল বা তার অব্যবহিত পরবর্তী অক্টোবর বিপ্লবের কোনো গভীর গভীরতর অসুখের সঙ্গে। জিভাগোর এই যুক্তিটাই পাস্তেরনাকের বন্ধুমহলকে প্রবল অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছিল।

১৯৪৯ সালে পাস্তেরনাকের প্রেমিকা ওলগা ইভিনস্কায়া রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। এর আগে ১৯৪৬ সালে আখমাতভা ও রম্যরচনার লেখক মিখাইল জোশেঙ্কো রাইটার্স ইউনিয়ন দ্বারা তিরস্কৃত হন। এর সদস্যপদও খারিজ হয় তাঁদের। এমনকি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে নিন্দা প্রস্তাবও আনা হয় তাঁদের বিরুদ্ধে। এর আঁচ থেকে পাস্তেরনাকও সে সময় নিজেকে রক্ষা করতে পারেননি। 'তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে আপাদমস্তক ধারণ করেন অথচ এটা আমাদের সমাজের জন্য একটি বিজাতীয় ধারণা,' এ কথা এমনকি রাইটার্স ইউনিয়নের তদানীন্তন সেক্রেটারি আলেকসান্দর ফাদায়েভের মুখ দিয়ে বের হয়েছিল। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৪ সাল—এই আটটি বছর পাস্তেরনাকের কোনো মৌলিক কাজ সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকাশিত হয়নি। ব্যতিক্রম ছিল শুধু তাঁর করা অনুবাদ রচনাসমূহ। এসবই প্রভাব ফেলে থাকবে তাঁর মনে। জিভাগোর মাধ্যমে পাস্তেরনাক এসব প্রতিকূলতাকে নৈতিকভাবে অস্বীকার করতে চাইছিলেন। এ কথা ১৯৪৯ সালের ৭ আগস্ট তাঁর বোন ওলগাকে এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন, 'যেকোনো কারণেই হোক আজ আমার মন ভারী হয়ে আছে। জীবনের কোনো অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না আর। এখন আমার যা ভূমিকা তা পূর্বনির্ধারিত ও অপরিবর্তনীয়; আত্মমর্যাদার সঙ্গে আমাকে এই ভূমিকা পালন করতে হবে। ঈশ্বরের সহায়তায় যদি বাঁচি, তাহলে উপন্যাসটা শেষ করতে চাই। আমার সমস্ত অসমাপ্ত কাজ শেষ করে আনতে চাই। এটা করা দরকার। আর আমার কাছের ও প্রিয় মানুষদের অবশ্যই সুখী দেখে যেতে হবে।'

১৯৫৬ সালে উপন্যাসটির রচনা শেষ হয়। পাস্তেরনাক *নোভি মির* ও *জ্নামিয়া* দুটো সাময়িকীতেই সেটা ছাপানোর জন্য পাঠান। এর আগে ১৯৫৪ সালে *ডক্টর জিভাগো* উপন্যাসের 'জিভাগোর কবিতা' অংশ থেকে দশটি কবিতা *জ্নামিয়া* পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। সে সময়ই পাস্তেরনাক উপন্যাসটির একটি খসড়া মস্কো রেডিওর ইতালীয় বিভাগে কর্মরত সের্গিও দ্য এনজেলোকে পড়তে দেন। সের্গিও ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন এবং মিলানের এক প্রকাশককে চিনতেন। পাস্তেরনাক পরবর্তী সময়ে সের্গিওকে বলেছিলেন তাড়াহুড়ো না করতে, 'যদি এখানকার সাময়িকী উপন্যাসটার প্রকাশনা বন্ধ রাখে আর তুমি প্রথমে ছাপিয়ে ফেলো, তাহলে পুরো পরিস্থিতি আমার জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।' ইতালিতে যে তাঁর বই প্রকাশ করার তোড়জোড় চলছে, সেটা ইচ্ছে করেই সোভিয়েত প্রকাশনাজগতের আমলাতন্ত্রের কাছে গোপন রাখেননি তিনি। যা করার তিনি পার্টিকে জানিয়েই করতে চান।

তার পরও রাষ্ট্রীয় রোষের থেকে নিজেকে আড়াল করতে পারলেন না পাস্তেরনাক। এর সবগুলো কারণ উপন্যাসটির বিষয়বস্তুর সঙ্গেও জড়িত নয়। ১৯৫৬ সালে স্তালিনের মৃত্যুর পরে, এরেনবুর্গের ভাষায়, 'বরফ গলতে' শুরু করল ঠিকই, কিন্তু গলতে গলতে সে বরফ আবারও 'জমাট বাঁধা' শুরু করল। আর কে না জানে এ ধরনের অবস্থায় বরফের ওপর দিয়ে চলা আরও দুরূহ, আরও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৫৬ সাল থেকেই সংস্কারের পথে চলা পার্টি দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। হাঙ্গেরিতে বিদ্রোহ দমাতে ঢুকে পড়ে সোভিয়েত ট্যাংক ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে। নভেম্বর মাসে পোল্যান্ডেও বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়।

এ অবস্থার মধ্যে সেপ্টেম্বর মাসে *নোভি মির* সাময়িকী *ডক্টর জিভাগো*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপন্যাসটি ছাপাতে পারবে না বলে লেখককে জানিয়ে দেয়। এরপর পাস্তেরনাকের মনে আর সন্দেহ থাকে না যে, সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও উপন্যাসটি খুব শিগগিরই প্রকাশের মুখ দেখবে না সোভিয়েত ভূমিতে। এ অবস্থায় ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইতালিতে বইটি প্রথম প্রকাশের মুখ দেখে। ১৯৫৮ সালে ইংরেজি ভাষায় এর সংস্করণ বের হয়। অক্টোবর বিপ্লবের পর আর কোনো রুশ বই নিয়ে এত আলোড়ন সৃষ্টি হয়নি বহির্বিশ্বে। ১৯৫৮ সালের ২৩ অক্টোবর সুইডিশ নোবেল কমিটি পাস্তেরনাককে কেবল-বার্তা পাঠিয়ে জানায় যে, ওই বছরের সাহিত্যে নোবেল পেয়েছেন তিনি। কনস্তানতিন ফেদিন ছিলেন তখন রাইটার্স ইউনিয়নের মস্কো শাখার প্রধান। তিনি লেখক হিসেবে সুপরিচিত, কিন্তু তাঁর বড় পরিচয় তিনি পাস্তেরনাকের দীর্ঘকালের বন্ধু। ফেদিন পাস্তেরনাককে গিয়ে অনুরোধ করলেন নোবেল পুরস্কারটি প্রত্যাখ্যান করতে। পাস্তেরনাক দ্বিধান্বিত ছিলেন এ নিয়ে। এর পরপরই সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে রাইটার্স ইউনিয়ন থেকে বহিষ্কার করা হলো, আখমাতভাকে যা করা হয়েছিল ১৯৪৬ সালে। এর অর্থ—আয়ের সব বৈধ উৎস বন্ধ হয়ে গেল পাস্তেরনাকের জন্যও। ২৯ অক্টোবর পাস্তেরনাক সুইডিশ একাডেমিতে কেবল-বার্তা পাঠালেন: যেহেতু তাঁর পুরস্কার প্রাপ্তিকে তাঁর দেশে নেতিবাচকভাবে দেখা হচ্ছে, সেহেতু তাঁকে নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করতেই হচ্ছে। রাইটার্স ইউনিয়ন শুধু বহিষ্কারেই থেমে রইল না। ইউনিয়ন ভোট গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত নিল যে পাস্তেরনাককে দেশ থেকেই বহিষ্কার করতে হবে। পাস্তেরনাক ব্যক্তিগতভাবে আরজি জানিয়ে চিঠি লিখলেন খোদ ক্রুশ্চেভকে। সেখানে তিনি বললেন, 'আমি রাশিয়ার সঙ্গে জন্মসূত্রে বাঁধা, জীবন দিয়ে বাঁধা ও আমার কর্ম দিয়ে বাঁধা। রাশিয়ার বাইরে—এবং রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে—আমার কোনো ললাটলিখন আমি কল্পনাও করতে পারি না।' এর তিক্ত অভিজ্ঞতা পাস্তেরনাক বর্ণনা করেছেন 'নোবেল পুরস্কার' কবিতায়, যার মর্মার্থ এ রকম: 'কী এমন নোংরা কাজ আমি করেছি? আমি কি খুনি নাকি বদমাশ? সমস্ত পৃথিবী এখন কাঁদছে আমার জন্মভূমির সৌন্দর্যে।'

চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে চলা জিভাগোর জীবন অবশ্য সমাজতন্ত্রের প্রতি পাস্তেরনাকের মৌলিক আস্থা স্থাপনে কখনো চিড় ধরায়নি। ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি বেরোনো *পিপল অ্যান্ড অ্যাটিচুড* শীর্ষক আত্মজীবনীতে লেনিন সম্পর্কে তিনি লিখছেন, 'লেনিন ছিলেন অসামান্য দ্যুতিময় আস্থা ও বিবেক, তিনি ছিলেন সেই বিরাট রুশি ঝড়ের বাস্তবতা ও তার কণ্ঠস্বর—একেবারেই তুলনারহিত ও ব্যতিক্রমী। প্রতিভাবানের নিষ্ঠা নিয়ে অবিচলভাবে তিনি তাঁর নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন সমস্ত রক্তক্ষয় ও ধ্বংসের সব দায়দায়িত্ব, যে রকমটা পৃথিবী আর কখনো দেখেনি। তিনি নিষ্কম্প্র মন নিয়ে একত্রে জড়ো হওয়ার ডাক দিয়েছেন সাধারণ মানুষকে, যাতে তারা তাদের সবচেয়ে গোপনে লালিত আকাঙ্ক্ষাগুলোকে জীবিত করার জন্য জেগে ওঠে। তিনি সাগরকে ফুঁসে উঠতে দিয়েছেন এবং ঘূর্ণিঝড়কে মাথার ওপর দিয়ে বয়ে যেতে দিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছাশক্তি ছাড়া এটা হতো না।' এই প্রশস্তিগাথার মধ্যেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত দায়দায়িত্বের প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল। *ডক্টর জিভাগো* উপন্যাসের এক জায়গায় জিভাগো বলছে:

> আমাকে একজন ডাক্তার বা লেখক হিসেবে ফলপ্রসূ হতে বাধা দিচ্ছে কোন ব্যাপারগুলো? সেটা আমাদের অভাব নয় অথবা নয় আমাদের যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়ানো; এমনকি প্রতিনিয়ত বদলে যাওয়া আমাদের অস্থির জীবনধারাও নয়। আমাকে বাধা দিচ্ছে আজকের দিনের স্লোগানগুলোর দাপট—কী রকম পুনরুক্তিময় এই শব্দগুলো: 'ভবিষ্যতের উষালগ্ন', 'নতুন পৃথিবীর নির্মাণ', 'মানবসভ্যতার মশাল বয়ে বেড়াচ্ছি আমরা'—এই সব। প্রথমবারের মতো যখন শব্দগুলো শুনি মনে হতো: 'কী সাংঘাতিক কল্পনাশক্তি'। কিন্তু যে কারণে এই স্লোগানগুলো গালভরা শোনায় তা হলো আসলে এদের পেছনে কোনো কল্পনাই নেই, কেননা এর পেছনে কাজ করছে যে চিন্তা, সেটাই দ্বিতীয় শ্রেণীর।

পাস্তেরনাক এই দ্বিতীয় শ্রেণীর চিন্তা আর কল্পনাশক্তিহীন স্লোগানধর্মী বক্তব্যের বা ডিসকোর্সের বিরুদ্ধে সারা জীবন লড়ে গেছেন। এই যুদ্ধে আমৃত্যু তাঁর সহচর ছিলেন আন্না আখমাতভা, নিকোলাই গুমিলিয়ভ, ওসিপ মান্দেলস্তাম ও মারিনা সিভেতায়েভা।

স্তালিনের মৃত্যুর পর আখমাতভার শেষ জীবন কেটেছিল কোনো ধরনের বিপর্যয় ছাড়াই। তার পরও সতর্কতার সঙ্গে চলছিলেন তিনি। ১৯৫৬ সালে জেল থেকে অবশেষে ছাড়া পেলেন লেভ গুমিলিয়ভ। সে সময় দার্শনিক ইসাইয়াহ্ বার্লিন রাশিয়ায় এসেছিলেন। টেলিফোন করেছিলেন আন্নাকে দেখা করতে চেয়ে। রাজি হননি তাতে আখমাতভা। ভয় পেয়েছিলেন পাছে ১৯৪৬ সালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। ওই বছর বার্লিনের সঙ্গে দেখা করার অপরাধে যে আন্নাকে রাষ্ট্রের ভর্ৎসনা শুনতে হয়েছিল, সে কথা ১০ বছর পরও ভুলে যাওয়ার কথা নয়। তবু ১৯৫৬ সালের পর থেকে ১৯৬৬ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত আন্নার জীবন কেটেছিল ভালোভাবেই। ১৯৫৮ সালে আন্নার নির্বাচিত কবিতার সংকলন বের হয়। স্তালিন-পরবর্তী যুগে এটাই ছিল আন্নার প্রথম প্রকাশনা। ১৯৬০ সালে বের হয় তার *কবিতা-সমগ্র (১৯০৯-১৯৬০)*, ছাপা হয় ৫০ হাজার কপি। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয় মদিলিয়ানিকে নিয়ে তাঁর স্মৃতিকথা—ইতালিতে তা আলোড়ন তোলে। ১৯৬২ সালে কবি রবার্ট ফ্রস্ট আসেন লেনিনগ্রাদে। রবার্ট ও আন্না এক দীর্ঘ সময় ধরে প্রাচীন গ্রিক ও ল্যাটিন সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন। ১৯৬৩ সালের দিকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনুবাদের কাজে মনোযোগ দেন আখমাতভা। এই সময়েই, ১৯৬৪ সালে, প্রথমবারের মতো নোবেল পুরস্কারের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে আন্নার নাম শোনা যেতে থাকে, যদিও শেষ পর্যন্ত সে পুরস্কার তাঁর পাওয়া হয়নি। ১৯৬৪ সালে ইতালিতে ও পরে অক্সফোর্ডে যান তিনি। ১৯১২ সালের পর এই প্রথম তাঁর বিদেশে যাওয়া। অক্সফোর্ডে ইসাইয়াহ্ বার্লিনের সঙ্গে আবার মিলিত হন, বক্তৃতা দেন এবং সম্মানসূচক ডিলিট পান।

পুত্র লেভের সঙ্গে সম্পর্কে আন্নার টানাপোড়েন লেগেই থাকে। এথনোগ্রাফির বা নৃজাতিতত্ত্বের গবেষক হিসেবে লেভের খ্যাতি ১৯৬০-৭০-এর দশকে সারা রাশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৯২ সালে সেন্ট পিটার্সবুর্গে মারা যান তিনি। নৃজাতিতত্ত্বে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কাজাখস্তানের প্রেসিডেন্ট নুর সুলতান নাজারবায়েভের উদ্যোগে তাঁর নামে কাজাখস্তানের রাজধানী আস্তানাতে লেভ গুমিলিয়ভ ইউরেশিয়া ইউনিভার্সিটি গড়ে ওঠে।

১৯৪৬ সালে আখমাতভার বিরুদ্ধে যখন নতুন করে রাষ্ট্রের তরফ থেকে বিরুদ্ধতা উচ্চারিত হতে থাকে, তত দিনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ, হিটলার পরাস্ত, সমগ্র বিশ্বে তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়জয়কার, এমনকি ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে আবির্ভূত হয়েছে এক শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রজোট। সে সময় আখমাতভা তীব্র বিষোদ্‌গারপূর্ণ সমালোচনায় তাড়িত-ব্যথিত হয়ে শুধু একটিই প্রশ্ন করেছিলেন তাঁর পরাক্রমশীল প্রতিপক্ষদের, 'আচ্ছা, আমাকে বলুন তো, কেন আমার এই বিশাল মহান দেশ—যেটি হিটলারকে তার সমস্ত প্রযুক্তিসমেত হটিয়েছে—শেষ পর্যন্ত তার দরকার পড়ল এক রুগ্‌ণ বৃদ্ধা নারীর বুকের ওপর দিয়ে অগ্রসর হওয়ার?'

গণতন্ত্র, ভিন্নমতের প্রতি সহিষ্ণুতা ও সমাজতন্ত্র—এই ধারণাগুলো পরস্পরের থেকে ছিটকে যেতে পারে না। তত্ত্ব বলে, এই তিনটি ধারণার একই পরিবারের সদস্য হওয়ার কথা, রক্তের সম্পর্ক থাকার কথা এদের মধ্যে। কেন এমন হলো, আখমাতভার প্রশ্নটি তো আমাদেরও। ❦

খসড়া: জুলাই-অগাস্ট ২০১২, পরিমার্জনা জুন-জুলাই ২০১৩

সূত্র: এ লেখার জন্য অনেকগুলো ইংরেজি ও রুশ ভাষার প্রামাণ্য গ্রন্থ আমাকে ব্যবহার করতে হয়েছে। তার মধ্যে ইংরেজি ভাষায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কবি ও অনুবাদক এলেইন ফেইনস্টেইনের *আন্না অব অল দ্য রাশিয়াস: আ লাইফ অব আন্না আখমাতভা*, ডিউক ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত লিলি ফেইলারের *মারিনা সিভেতায়েভা: দ্য ডাবল বিট অব হেভেন অ্যান্ড হেল*, নাদিয়েঝদা মান্দেলস্তামের *হোপ অ্যাগেইনস্ট হোপ* ও *হোপ অ্যাবানডন্ড* গ্রন্থদ্বয়, আর পাস্তেরনাকের ওপর কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রকাশিত ক্রিস্টোফার বার্নসের লেখা দুই খণ্ডের জীবনীগ্রন্থ *বরিস পাস্তেরনাক: আ লিটারেরি বায়োগ্রাফি*।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~